মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) এবং তার জামাতের বিরুদ্ধে আরোপিত আপত্তি ও মিথ্যাচারসমূহের জবাব

সূচিপত্র

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেন, "আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা'লা ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় এবং যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**-এর ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়েই মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসূমহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় বলে মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকীদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে সেসব সর্বোতভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এ সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহি আলাল কাযিবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীন" অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।" (আইয়ামুস্ সুলেহ্, পৃষ্ঠা ৮৬ ও ৮৭)

আপত্তি- পাঁচ পঞ্চাশের সমান

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ নীতি-নৈতিকতার পরিচ্ছদে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন, তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ রচনার প্রাক্কালে বলেছিলেন, তিনি পঞ্চাশ খণ্ডে এই বইটি রচনা করবেন। আর একথা বলে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদাও নিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁচ খণ্ডে লেখা সমাপ্ত করে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, এ পাঁচটিই পঞ্চাশের সমান। এটি এক ধরনের প্রতারণা।

উত্তর: 'পাঁচ পঞ্চাশের সমান' গাণিতিক হিসেবে একথা কখনো সঠিক নয়। গাণিতিক হিসেবে একথা বলাও হয় নি। বরং এ বাক্যের মাঝে নিশ্চয় এর চেয়ে গভীর কোন বিষয় লুকিয়ে আছে। যে ব্যক্তি গাণিতিক হিসেবে পাঁচ আর পঞ্চাশকে সমান বলে মনে করে সে বদ্ধ পাগল ছাড়া কিছুই নয়। আর বদ্ধ পাগলের বিরোধিতা পাগল ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। 'আল্লামা' মজিদ সাহেবের এই অভিযোগ উত্থাপন প্রমাণ করছে তার দৃষ্টিতেও মির্যা সাহেব পাগল **(নাউযুবিল্লাহ্)** নন। কেননা এমনটি হলে তিনি আপত্তিই করতেন না। এখানে এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, তাহলে মির্যা সাহেব কোন হিসেবে পাঁচ ও পঞ্চাশকে সমান বলেছেন।
আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে পুণ্যকর্মের পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ

যে-ই পুণ্যকর্ম করবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দশগুণ পুণ্য। (সূরা আনআম: ১৬১ আয়াত)

এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'লা নিজ অনুগ্রহে পুণ্যকর্মকে বৃদ্ধি দান করেন। কী অর্থে বৃদ্ধি দান করেন? প্রভাব ও ফলাফলের দিক থেকে বৃদ্ধি দান করেন। অর্থাৎ একটি পুণ্যকর্ম নিজ প্রভাবও ফলাফলের দিক থেকে ন্যূনতম দশগুণ হয়ে থাকে। একইভাবে মেরাজের হাদীসে উল্লেখ আছে, আল্লাহ্ তা'লা যখন বার বার অনুরোধের প্রেক্ষিতে পঞ্চাশ বেলার নামাযকে কমিয়ে পাঁচ বেলা করে দিলেন তখন তিনি বলেছিলেন,

فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهْيَ خَمْسُونَ،

অর্থাৎ 'এই পাঁচই পঞ্চাশের সমান'*(বুখারী: কিতাবুস সালাত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৯৯, হাদীস নম্বর-*

৩৪২)। অর্থাৎ এগুলো বাহ্যিকভাবে যদিও পাঁচ বেলার নামায কিন্তু প্রভাব ও ফলাফলের দিক থেকে এগুলো পঞ্চাশ বেলার নামাযের সমান বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে, মির্যা সাহেব বলেছেন, আমার প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রভাব ও ফলাফলের দিক থেকে পঞ্চাশ খণ্ডের সমান বলে পরিগণিত হবে।

সুধী পাঠক, 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের পূর্ণ নাম হল, 'বারাহীনে আহমদীয়া আলা হাকীকাতে কিতাবিল্লাহিল কুরআন ওয়ান্ নুবুওয়াতিল মুহাম্মাদিয়াহ'। যার অর্থ হল: আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি। এই অর্থ ও শিরোনামটি মাথায় রেখে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে, হযরত মির্যা সাহেবের লিখিত সমস্ত গ্রন্থ ও রচনা এই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

এবার বাকি রইল মানুষের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের বিষয়টি। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ কেবল ৫০খণ্ড প্রকাশের জন্য মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহের কথা প্রচার করেছেন কিন্তু টাকা ফেরত নিয়ে নেয়ার জন্য হযরত মির্যা সাহেব যে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন সে কথা তিনি ঘুণাক্ষরে ও উল্লেখ করেন নি এবং অনেকেই যে মির্যা সাহেবের কাছ থেকে তাদের টাকা ফেরত নিয়ে নিয়েছেন যার উল্লেখ 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে থাকলেও তা 'আল্লামা' মজিদ তার বইতে উল্লেখ করেন নি! আসলে চর্বিত চর্বণ তুলে ধরলে যা হয় আর কি! সমস্ত পুস্তক না পড়েই তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণে আপত্তির জন্য আপত্তি করেছেন 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) স্পষ্ট বলেছেন, 'যারা (গ্রাহকবৃন্দ) ভবিষ্যতে নিজেদের টাকার কথা মনে করে এই অধমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য প্রস্তুত বা যাদের হৃদয়ে কুধারণার সৃষ্টি হতে পারে তারা দয়া করে স্বেচ্ছায় আমাকে পত্রযোগে অবগত করুন, আমি তাদের টাকা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব' (তবলীগে রিসালাত, ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৫)।[১]

---

১. ১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এরপর বারাহীনে আহমদীয়ার ৫ম খণ্ডের ৭ পৃষ্ঠায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেন, 'যারা টাকা বা মূল্য দিয়েছিল তাদের অধিকাংশ একদিকে গালাগালিও করেছে আবার নিজেদের টাকা ফেরতও নিয়ে নিয়েছে।"[২]

প্রিয় পাঠক! 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব মির্যা সাহেবের সব বই পড়েছেন– এমন ভাবই দেখিয়েছেন। অতএব তিনি জেনেশুনে এই অংশগুলোকে জনগণের কাছ থেকে লুকিয়ে মানুষকে প্রতারিত করতে এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে মানুষকে উস্কানোর চেষ্টা করেছেন মাত্র।

আপত্তি- হাযা খালিফাতুল্লাহিল মাহদী বুখারীর হাদিস

'আল্লামা' আব্দুল মজিদের আপত্তিঃ মির্যা সাহেব বলেন, 'বুখারী শরীফের ঐ সকল হাদীসসমূহ যাতে শেষ যুগের কিছু খলীফাদের ব্যাপারে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ঐ খলীফা, যার ব্যাপারে আসমান থেকে এই ডাক আসবে যে, এই হল "আল্লাহর খলীফা মাহদী"। এবার ভাব, এটা কেমন মর্যাদাবান কিতাব, যাকে কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ মনে করা হয়!?' *[রূহানী খাযায়েন ৬/৩৩৭]* 'আল্লামা'র মূল আপত্তি হল, বুখারী শরীফের আশ্রয় নিয়ে মির্যা সাহেব নিজের ইমাম মাহদী হবার দাবীকে দৃঢ় করার চেষ্টা করেছেন অথচ এই হাদীসটি বুখারীতে নেই! সত্য দাবীর জন্য মিথ্যা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

উত্তরঃ আমরা মির্যা সাহেবকে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর কল্যাণে উম্মতী নবী হিসাবে মেনেছি। নবী মানুষ হয়ে থাকেন, তিনি খোদা নন। একমাত্র আল্লাহ্ সকল ভুল-ত্রুটি ও স্মৃতি-ভ্রমের ঊর্ধ্বে। নবী-রসূলরা মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নন। তদনুযায়ী বিভিন্ন সময় তাদের স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে। হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে লেখা আছে,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশনা দিয়েছিলাম, অতঃপর সে ভুলে গেল কিন্তু তার মাঝে আমি ইচ্ছাকৃত পাপ করার প্রবণতা দেখতে পাই নি (সূরা তাহাঃ ১১৬)। হযরত আদম(আ.)-এর এই ভুল করা সত্ত্বেও তাঁর নবী হওয়া নিয়ে কারও মনে কোন সংশয় নেই।

২. ১৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হযরত মূসা(আ.) এবং তাঁর সাথী পথ চলতে চলতে নিজেদের মাছের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা আছে,

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا হযরত মূসা এবং তার সহচর উভয়ে মাছটির কথা ভুলে গেলেন (সূরা কাহ্ফ: ৬২)। এ স্মৃতিভ্রম সত্ত্বেও আপত্তিকারী 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের দৃষ্টিতে নিশ্চয় হযরত মূসা(আ.) সত্য নবী হিসেবেই স্বীকৃত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। বুখারী শরীফের কিতাবুস সালাত- এর হাদীসটি দেখুন যেখানে বলা আছে,

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ ". فَقَالَ " أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ". فَقَالُوا نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ،

একবার আসরের নামাযে দু'রাকাত পড়ে মহানবী(সা.) সালাম ফিরিয়ে দিলেন। যুল ইয়াদাইন(রাযি.) বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন নাকি নামায সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে? তিনি(সা.) বললেন, আমি ভুলেও যাই নি আর নামায সংক্ষিপ্তও করা হয় নি। এরপর রসূলুল্লাহ্(সা.) উপস্থিত সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলছে আসলে কি তাই? মুসুল্লীগণ বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি(সা.) অবশিষ্ট নামায আদায় করলেন। (বুখারী কিতাবুস্ সালাত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারী শরীফ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬১ হাদীস নম্বর-৪৬৬)

উপরোক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, আমি ভুলেও যাই নি বা নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয় নি। অথচ সাহাবা(রা.) সাক্ষী দিলেন, ভুল হয়েছে। এরপর তিনি(সা.) ভুলটিকে সংশোধন করে নিয়ে অবশিষ্ট দু'রাকা'ত নামায আদায়ও করলেন। আর মহানবী(সা.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ-إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

তিনি(সা.) প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না, যা বলেন তা ওহীই হয়ে থাকে (সূরা নজম: ৪-৫)। 'আল্লামা' কি তাহলে মুহাম্মদ(সা.)-এর বিরুদ্ধেও আপত্তি করবেন? পাঠক, এখানে আপত্তির কিছু নেই। এর মাধ্যমে মহানবী(সা.) বা অন্যান্য নবীরা নাউযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন না বরং প্রমাণ হয় আল্লাহ্র নবীগণ মানুষ এবং তারা মানবীয় সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। এ সত্ত্বেও সর্বশক্তিমান খোদা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং শত দুর্বলতা সত্ত্বেও

তাদেরকে জয়ী করে দেখান। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র জীবন্ত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যে নবী আল্লাহ্‌র ওহী না পেয়ে কথা বলেন না তিনি(সা.) মদিনায় খেজুরের পরাগায়ণ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা কি ফলপ্রসু হয়েছিল? পরবর্তী বছর খেজুরের ফলন কম হলে সাহাবীরা যখন বললেন, রসূল(সা.)-এর কথানুযায়ী তারা পরাগায়ণ করান নি। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছিলেন,
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ অর্থাৎ জাগতিক বিষয়ে তোমরাই ভাল জ্ঞান রাখ। এখন বলুন, এর আগের বছর যখন তিনি পরাগায়ণ করতে নিরুৎসাহিত করেছিলেন তখন কি তিনি ওহীপ্রাপ্ত ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু কোন মানুষের ওহীপ্রাপ্ত হওয়া কাউকে ইশ্বরত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায় না। তিনি মানুষই থাকেন। মানবীয় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর সাফল্য ও তাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধন তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধি সাব্যস্ত করে।

তেমনিভাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)ও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েও যেহেতু তিনি মানুষ ছিলেন তাই তাঁর দ্বারাও স্মৃতিভ্রম জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। তিনি নিজেই বলেছেন,
'আমার দ্বারা যেসব ভুল হয় তা মানুষ হিসেবে আমার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে আর যেসব সত্য আমি বর্ণনা করি তা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে। আমার প্রভু আমাকে তত্ত্বজ্ঞানের পেয়ালা পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। সেই সাথে এটিও বলে দিচ্ছি, আমি আমার নিজেকে ভুল করা এবং স্মৃতি-বিভ্রাট থেকে পবিত্র বলে মনে করি না' (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৮ পৃষ্ঠা-২৭২)।[৩]

অতএব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) **'হাযা খালীফাতুল্লাহিল্ মাহ্‌দী'** হাদীসটি বুখারীতে আছে বলে যে কথা লিখেছেন, এক্ষেত্রেও আমরা সে উত্তরই দিব যা হযরত মোল্লা আলী কারী(রহ.) আল্লামা ইবনে রাবী' সম্পর্কে দিয়েছেন আর তা হল, **হয় এটি লিপিকারের ভুল, নইলে লেখকের লেখার ভুল।** কেননা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) তাঁর পুস্তক 'ইযালায়ে আওহামে' স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমি বলি, ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সন্দেহমুক্ত নয়, তাই শায়খাইন (অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) এগুলোকে গ্রহণ করেন নি' (পৃষ্ঠা ৫৬৮)। অতএব বুঝা গেল, **'হাযা খালীফাতুল্লাহিল মাহদী'** হাদীসটি যে বুখারীতে নেই একথা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) জানতেন এবং আগেই তা জনসমক্ষে প্রকাশ

৩. ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। আর পরবর্তীতে প্রকাশিত **‘শাহাদাতুল কুরআন’** পুস্তকে তিনি যা লিখেছেন তা স্মৃতিভ্রম বা মানবীয় দুর্বলতা হেতু ভুল অথবা কলম ফসকে লেখা (সাব্‌কাতে কলম) বা মুদ্রণ প্রমাদ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

হ্যা, তবে এই হাদীসটি সেভাবেই ‘সহীহ’ হিসেবে পরিগণ্য যেভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস ‘সহীহ্’। কেননা, এ হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী(রহ.) বলেছেন এবং **‘যাওয়ায়েদে’**ও বর্ণিত হয়েছে, এর সনদ সঠিক এবং এর বর্ণনাকারীগণ সিক্বাহ অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। আর ইমাম হাকেম(রহ.) তার **‘মুসতাদরেক’**-এর কিতাবুত তাওয়ারীখে এটি সংকলন করেছেন এবং বলেছেন, এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তাবলী অনুযায়ী সহীহ্ বা সঠিক। (ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান বাবু খুরূজিল মাহদী, মিশর থেকে প্রকাশিত ২৬৯ পৃষ্ঠার পাদটিকা)

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ সাহেব নিজের জ্ঞানের ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছেন ২০ নম্বর পৃষ্ঠায়। তিনি এখানে আপত্তি করেছেন, মির্যা সাহেব যা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন, নিজের পক্ষ থেকে বলেন না। মির্যা সাহেব যদি সত্যিই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরিচালিত হয়ে থাকেন তাহলে তার দ্বারা এ কাজ হল কীভাবে? এটিই ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদের প্রধান প্রশ্ন।

হ্যাঁ, একথা সত্য, নবী-রসূলগণ আল্লাহ্‌র হাতের পুতুল হয়ে থাকেন। যদি মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট হয়ে এ কথা লিখেই থাকেন তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে, আল্লাহ্ তা’লা তাঁর মাধ্যমে আলেম-উলামাদের দৃষ্টি এই হাদীসের উচ্চ মান ও মার্গের দিকে আকৃষ্ট করাতে চেয়েছেন। এই হাদীস সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতী কী বলেছেন, আরেকবার দয়া করে ওপরে দেখে নিন। এছাড়া মুসতাদরিক-এর হাদীস সম্বন্ধে একথা ‘আল্লামা’র নিশ্চয়ই জানা আছে, এটি ‘আলা শারায়েতে সাহীহাইন’ অনুযায়ী সংকলিত। এমনও হতে পারে ‘মুসতাদরিক আলা শারায়েতে বুখারী’ লেখা হয়েছিল কিন্তু লিপিকার লিখতে গিয়ে পূর্ববর্তী তিনটি শব্দ বাদ দিয়ে ফেলেছে।

আরেকটি উদাহরণ দিয়ে উত্তর শেষ করছি যা বাংলাদেশের আলেম উলামারা সহজেই বুঝতে পারবেন। আমাদের দেশে তারাবীর নামাযে খতমে কুরআন পড়ার সময় কখনো কখনো হাফেয সাহেবরা ভুলে যান বা কিছু আয়াত অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যায়। এটিকে হাফেয সাহেবদের প্রতারণা বলা যায় না বরং এটি তাদের স্মৃতিভ্রম মাত্র।

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদের মত এত বড় বিজ্ঞ আলেম নিশ্চয় এসব জানেন। তিনি জানেন, ১৮৯১ সালে লেখা ইযালায়ে আওহামে স্পষ্টভাবে মির্যা সাহেব লিখেছেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মাহ্‌দী সংক্রান্ত কোন হাদীস বর্ণিত হয় নি আর আলোচ্য শাহাদাতুল কুরআন পুস্তক প্রকাশের বহু পরে রচিত পুস্তকেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এসব জানা থাকা সত্ত্বেও ‘আল্লামা’ এমন আপত্তি কেন তুলছেন। তাহলে কি ‘আল্লামা’ মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য এমন কপটতাপূর্ণ নীতি ও মানদণ্ড দাঁড় করিয়েছেন?

অতএব মির্যা সাহেব মিথ্যা কথা বলে মানুষকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের দিকে আহ্বান জানান নি বরং তিনি সত্যসহকারে আবির্ভূত হয়েছেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র সত্য পথে আহ্বান করেছেন। যুগে যুগে যখনই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্টরা এসেছেন, সমসাময়িক আলেম- উলামা তাদেরকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অযথা আপত্তির পর আপত্তি করেছে। তাই ‘আল্লামা’র এসব আপত্তিও আল্লাহ্‌র বিধান পরিপন্থী কিছু নয়। আর ‘আল্লামা’ নোংরা গালি উল্লেখ করে মির্যা সাহেবের প্রতি আরোপ করেছেন। ৩৬-৪৪ পৃষ্ঠায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

আপত্তি : সহীহ্‌ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, মসীহে মাওউদ শতাব্দির শুরুতে আসার কথা এবং সে চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হবে। (রুহানী খাযায়েন ২১/৩৫৯)

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ সাহেব ভালভাবেই জানেন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا أَعْلَمُعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর কাছ থেকে যেসব বিষয় জেনেছি তার মাঝে তিনি একথাও বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে এমন এক বা একাধিক ব্যক্তি আবির্ভূত করবেন যিনি ধর্মের সংস্কার সাধন করবেন। (আবু দাউদ: কিতাবুল মালাহিম)

এই হাদীসের আলোকে এই উম্মতের বিদগ্ধ আলেমরা বিশ্বাস করতেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ মাহদীই হবেন।

আহলে হাদীস আলেম সম্প্রদায়ের শিরোমণি নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব তের শতাব্দীর মুজাদ্দেদদের একটি তালিকা দেয়ার পর লিখেছেন, 'চতুর্দশ শতাব্দী শুরু হতে আর মাত্র দশ বছর বাকি আছে। যদি এই শতাব্দীতে মাহদী ও ঈসা(আ.)-এর আবির্ভাব হয়ে যায় তাহলে তিনিই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ ও মহাপুরুষ হবেন।' *(হুজাজুল কিরামাহ ফী আসারিল কিয়ামাহ, পৃষ্ঠা ১৩৯, শাহজাহানপুর, ভুপাল থেকে মুদ্রিত, প্রকাশকাল ১২৯১ হি.)*

এখন প্রশ্ন থাকে, মাহদী ও মসীহ্ যে শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হবেন এটা তো স্পষ্ট হল কিন্তু এই ঘটনা যে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগেই হবে এর প্রমাণ কি? বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য দেখুন ইবনে মাজা শরীফের কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ের হাদীস- الايات بعد المائتين অর্থাৎ সেইসব নিদর্শন দুইশ' বছর পর প্রকাশিত হবে।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত মোল্লা আলী আল-ক্বারী(রাহ.) লেখেন,

و يحتمل ان يكون اللام في المائتين للعهد أي بعد المائتين بعد الألف و هو وقت ظهور المهدي.

(মিরকাতুল মাসাবীহ্ শারহ্ মিশকাতিল মাসাবীহ্: কিতাবুল ফিতান বাবু আশরাতিস্ সাআ, হাদীস নম্বর-৫৪৬০)

অর্থাৎ খুব সম্ভব, আল মিয়াতাইন-এ 'লাম' অক্ষরটি 'আহ্দ যিকরি যেহনি'র জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ হল, এক হাজার বছরের পর দুই শ' বছর অর্থাৎ ১২০০ বছর পর এসব লক্ষণ প্রকাশিত হবে আর সেই যুগই ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের যুগ।

অতএব হাদীস থেকে মির্যা সাহেব শুধু একাই এই যুক্তি গ্রহণ করেন নি বরং এই উম্মতের অন্যান্য আলেমরাও একই অর্থ গ্রহণ করেছেন। অতএব এ বিষয়ে আল্লামার আপত্তি ধোপে টেকে না।

উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যায়, সংবিধান বিশেষজ্ঞরা যখন বলেন, এ বিষয়টি সংবিধানে আছে- তখন এটি আক্ষরিক অর্থে কেউ খুঁজতে যায় না বরং সামগ্রিক দৃষ্টিতে সংবিধানে প্রণিত নীতিমালায় বিষয়টি আছে অর্থে কথাটাকে নেয়া হয়।

ক) প্রসিদ্ধ বুযুর্গ **হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ্ ওলী** (৫৬০ হিজরী)
তিনি তাঁর বিখ্যাত ফারসী কবিতায় শেষ যুগের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তিনি লিখেছেন,
অনুবাদঃ যখন ১২০০ বছর অতিক্রম করবে তখন আমি অদ্ভূত অদ্ভূত দৃশ্য দেখি। যুগের মাহদী এবং এযুগের ঈসা উভয়কে ঘোড়ায় আরোহনরত অবস্থায় দেখেছি। (আরবাঈন ফী আহওয়ালিল মাহদীঈন, মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ সংকলিত পৃষ্ঠা ২, ৪ প্রকাশকাল ১২৬৮ হিজরী সন)

খ) **হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী** (১১১৪-১১৭৫ হিজরী)

عَلَّمَنِیْ رَبِّیْ جَلَّ جَلَالُهٗ اَنَّ الْقِيَامَةَ قَدِ اقْتَرَبَتْ وَالْمَهْدِیُّ تَهَيَّأَ لِلْخُرُوْجِ ـ

(التفہیمات الالٰہیہ جلد۲ صفحہ ۱۶۰ تفہیم نمبر ۱۴۶ شاہ ولی اللہ اکیڈمی دہلی)

আমার প্রভু আমাকে জানিয়েছেন, কিয়ামত সন্নিকট এবং মাহদী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন।

গ) **নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব** হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভীর বিষয়ে লিখেন,
'হযরত শাহ্ ওলী উল্লাহ্ ইমাম মাহদী(আ.)-এর আবির্ভাবের সময় চেরাগ দীন শব্দে বর্ণনা করেছেন, যা কিনা হুরুফে আবজাদ হিসাবে একহাজার দু'শত আটষট্টি ১২৬৮ হিজরী হয়। (হুজাজুল কিরামাহ্ ফী আসারিল কিয়ামাহ্ পৃষ্ঠা ৩৯৪) আশা করি মির্যা সাহেবের কথা যে ভিত্তিহীন নয় তা আপত্তিকারী এতক্ষণে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

আপত্তি : মসীহ্ (আ.) আসলে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে, ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। কুরআন ও হাদীসে এমন কথা আছে। (রুহানী খাযায়েন ১৭/৪০৪)

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বলা আছে,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

অর্থ: এরপর আমি একের পর এক রসূল প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছে (সূরা মোমেনূন: ৪৫)। অতএব প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ্‌র ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। আল্লাহ্ তা'লা এ নিয়মে কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করেন নি।

এরপর সূরা ইয়াসীনের ৩১ আয়াত দেখুন, আল্লাহ্ তালা বলছেন,

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

অর্থ : বান্দাদের জন্য আক্ষেপ! তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করে নি যার প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করেছে। (সূরা ইয়াসিন: ৩১) আরও দেখুন,

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

'এমনিভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোন রসূল আগমন করেছে, তারা বলেছে, যাদুকর, না হয় উন্মাদ' (সূরা যারিয়াত: ৫৩)।

নবীদের ঘোর বিরোধিতার অমোঘ ঘোষণা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট দেয়া থাকলেও এবং 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ-এর এসব আয়াত জানা থাকা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের কথাগুলোকে তিনি মনগড়া কথা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন।

আপত্তি : হাদীসে আছে আগত মাসীহ্ জুলকারনাইন হবে।

উত্তর: পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে জানা যায়, শেষযুগে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহর যুগে একদিকে যেমন রূপকভাবে বা প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ মুসলমানরা ইহুদী ও খ্রিস্টান হয়ে যাবে তেমনি রূপকভাবে বা প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ কিছু পুণ্যবান লোকেরও আবির্ভাব হবে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ 0حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ
وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 0

অর্থ্যাৎ যে জনপদকে আমরা একবার ধ্বংস করে দেই তাদের পুনরায় ফিরে আসা অসম্ভব, যতদিন পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজকে অবমুক্ত করা না হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচু স্থান থেকে ধেয়ে আসবে। (সূরা আম্বিয়া: ৯৬-৯৭)

এ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, ইয়াজুজ মাজুজের উন্নতির যুগে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহর যুগে পূর্ববর্তী মৃতদেরকে পুনরায় নিয়ে আসা হবে।

অর্থাৎ রূপক অর্থে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে (যেহেতু দৈহিকভাবে এ পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার পথ পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা রুদ্ধ)। মৃত পুণ্যবান ও ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে যুলকারনাইনও অন্যতম। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষযুগে অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজের উন্নতির যুগে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যিনি রূপকভাবে প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ যুলকারনাইন হবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেন, যে ব্যক্তির রূপকভাবে ও প্রতিচ্ছায়ারূপে যুলকারনাইন হয়ে আগমনের কথা আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আমিই সেই যুলকারনাইন। তিনি বলেন, "কতিপয় হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, আগমনকারী মসীহর একটি লক্ষণ হল, তিনি যুলকারনাইন হবেন। মোটকথা, ঐশী ওহীর ভিত্তিতে আমিই যুলকারনাইন।" (রূহানী খাযায়েন, ২১ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৮)

অপর এক স্থানে বলেন, 'কতিপয় হাদীসে মসীহ্ মাওউদের নাম যুলকারনাইন বর্ণিত হয়েছে।' (রূহানী খাযায়েন, ২০শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯ পাদটিকা)

মহানবী(সা.) প্রতিশ্রুত মাহদীকে যুলকারনাইনের সাথে সদৃশ্যপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। হযরত জাবের(রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসঃ

سمعت رسول اللہ ﷺ يقول ان ذا القرنين كان عبدا صالحا .. .. .. بلغ المشرق و المغرب و ان اللہ تبارک و تعالیٰ سیجزی سنتہ فی القائم من ولدی یبلغہ شرق الارض و غیرھا۔

অনুবাদঃ হযরত জাবের(রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী(সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি, তিনি(সা.) বলেছেন, যুলকারনাইন একজন পুণ্যবান বান্দা ছিলেন....যিনি পূর্ব-পশ্চিমে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার এই সুন্নত পুনরায় আমার সন্তান মাহ্দীর মাধ্যমে জারী করে দিবেন যে তার বাণীকে পূর্ব-পশ্চিমে পৌঁছে দিবে। [কামালুদ্দীন ও তামামুন নি'মাহ, মুহাম্মদ বিন আলী আলকুম্মী (মৃত্যুঃ ৩৮১ হি,) রচিত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৪; আল্লামা মজলিসী রচিত বিহারুল আনওয়ার, বয়রুত থেকে প্রকাশিত ১২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৫; সৈয়দ হাশেম হুসাইনী (মৃত্যু ১১০৭হি.) রচিত আল-বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭২; মাওলানা আব্দুল গফুর রচিত আন্ নাজমুস সাকিব ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪০, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৩, ১৩০৭ সনে পাটনা থেকে প্রকাশিত]

অতএব মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ভিত্তিহীন মনগড়া কোন কথা বলেন নি। যা হাদীসের বিভিন্ন সংকলনে বর্ণিত আছে তার বরাতেই কথা বলেছেন। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের এ বিষয়গুলো অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু সব জেনেও তিনি কেন এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা সুধী পাঠকরাই ভাল বলতে পারবেন।

আপত্তি : হাদীসে আছে, মসীহ ছয় হাজার সালে জন্ম নিবেন।

[রূহানী খাযায়েন ২২/২০৯]

উত্তর: এখানেও 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। মির্যা সাহেব একথা বলেন নি, 'হাদীসে আছে, মসীহ্ ছয় হাজার সালে জন্ম নিবেন।' বরং মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত উপস্থাপন করেছেন,

وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের প্রভুর একদিন তোমাদের গণনায় একহাজার বছর (সূরা হজ্জ: ৪৮)। আমাদের দিনের সংখ্যা মোট সাতটি। অতএব মোট সাত হাজার বছর। প্রতিশ্রুত মসীহ্(আ.) যে শেষযুগে আসবেন এ বিষয়ে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। মির্যা সাহেব লিখেছেন, বিভিন্ন হাদীস দিয়েও প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ ষষ্ঠ হাজার বছরে আবির্ভূত হবেন। আর মুফাসসেরগণ হযরত আদম(আ.) থেকে শুরু করে মুহাম্মদ(সা.) পর্যন্ত পাঁচ হাজার বছরের কিছু অধিক নির্ধারণ করেছেন। এই সাত হাজার বছরের উল্লেখ হাকীম তিরমিযীর 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণিত হাদীস এবং 'তারীখে ইবনে আসাকির' গ্রন্থে হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণিত হাদীস দিয়ে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মদ(সা.)-এর পর একহাজার বছরের একটি চক্র সমাপ্ত হবার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমনের কথা। মির্যা সাহেব উক্ত উদ্ধৃতির মাঝেই নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালের পুস্তক 'হুজাজুল কিরামার' বরাত দিয়ে বলেন, আবির্ভাবকাল সর্বোচ্চ চতুর্দশ শতাব্দী নির্ধারণ করা হয়েছে।

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ একদিকে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন অপরদিকে অপবাদ আরোপকারীদের চর্বিত চর্বণ উপস্থাপন করতে গিয়ে মূল উদ্ধৃতি না পড়ে আপত্তির পর আপত্তি করে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত ও সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা করছেন।

আপত্তি : একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অন্যদেশের নবীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশেই নবী আগমন করেছে। তিনি আরও বলেন, ভারতে একজন কাল রংয়ের নবী এসেছিলেন তার নাম কাহেন। *[রূহানী খাযায়েন ২৩/৩৮২]*

উত্তর: এই উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে তিনি আপত্তি করেছেন কোন হাদীস গ্রন্থে এই বাক্যের কোন হাদীস নাই। পাঠকবৃন্দ, রেফারেন্স দেয়ার পূর্বে এ উদ্ধৃতির প্রেক্ষাপট জানা দরকার। হযরত মির্যা সাহেব এ স্থলে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সামনে ইসলামের একটি বিশেষ সৌন্দর্য্য তুলে ধরেছেন।

হযরত মির্যা সাহেব বলেন, অন্যান্য ধর্মের অবস্থা হল, তাদের গ্রন্থ পড়, তাদের অনুসারীদের মতবাদ শুন তারা বলে, আল্লাহ্ কেবল আমাদের জাতিতেই, আমাদের দেশেই হেদায়াত দেয়ার ধারা অব্যাহত রেখেছেন আর অন্য কোন জাতিকে হেদায়াত দান করেন নি। অন্য কোন জাতিতে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শক পাঠান নি। বিষয়টি এমন যেন, রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্বকে বাদ দিয়ে কেবল একক একটি জাতির খোদা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আর এমন বিশ্বাস আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বের মর্যাদা পরিপন্থী। অথচ আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতেহায় বলেন, '**আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন**' সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সকল বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক। তাই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে আল্লাহ সারা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যেভাবে তিনি সব জাতির বাহ্যিক চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন তেমনইভাবে তিনি প্রত্যেক জাতির আত্মিক চাহিদা নিবারণের ব্যবস্থাও করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেছেন,

'প্রত্যেক জাতিতেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সতর্ককারী এসেছেন' (সূরা ফাতের: ২৫)। এ প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, **ওয়ালি কুল্লি কাওমিন হাদ** (সূরা হাজ্জ: ৩৫) প্রত্যেক জাতিতে পথপ্রদর্শক এসেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি প্রত্যেক জাতিতে রসূল পাঠিয়েছি। আর এই শিক্ষা দিতে তাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং শয়তানকে পরিহার করে চলবে। (সূরা নহল: ৩৭)

পরবর্তীকালে সেই ঐশী শিক্ষায় বিকৃতি হয়েছে। অনেক শিক্ষা বিলুপ্ত হয়েছে এবং অনেক শিক্ষা নিজেদের পক্ষ থেকে বানানো হয়েছে। তাদের প্রতি অনেক অনৈতিক কথা আরোপ করা হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব বলেন:

পবিত্র কুরআনের বিশেষ সৌন্দর্য হল, আল্লাহ্ তা'লা নিজেকে কোন বিশেষ জাতিতে সীমাবদ্ধ করেন নি। প্রত্যেক জাতিতে পথপ্রদর্শক এসেছে বলে কুরআন স্বীকার করে। প্রত্যেক জাতিতে আগমনকারী নবী এবং পথপ্রদর্শকদের সম্মান প্রতিষ্ঠা করে। এমনকি পবিত্র কুরআন বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মোমেন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রত্যেক জাতিতে আগত প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে না মানবে। এটি হল মূল বিষয়বস্তু। এটি হল সেই প্রেক্ষাপট যাতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর এতে আপত্তিকারীরা আপত্তি করে। এখানে মির্যা সাহেব হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন, كان في الهند نبيا اسود اللون হিন্দুস্তানে কালো রঙের এক নবী ছিল যার নাম ছিল কাহেন। এই হাদীস 'তারীখে হামদান দায়লামী'র বাবুল কাফে রয়েছে।

কিন্তু সাধারণ জনগণ যেহেতু এগুলো জানে না তাই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই আপত্তি বার বার লিখে প্রচার করা হচ্ছে। কালো রং-এর একজন নবী যে ছিলেন একথা হযরত আলী(রা.)-ও বর্ণনা করেছেন। عن عليّ رضي الله عنه : إنّ الله تعالى بعث نبياً أسود হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা কালো রং-এর নবী আবির্ভূত করেছিলেন (আল-কাশ্‌শাফ: ৩য় খণ্ড)। হযরত আলী(রা.) এই সংবাদ কোথায় পেলেন? নিশ্চয় তিনি মুহাম্মদ(সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। আসমাউর রিজাল-এ লেখা আছে, আহলে বায়তের সদস্যরা যখন কোন হাদীস বর্ণনা করতেন তখন এটি রসূল(সা.) বলেছেন বলে তারা উল্লেখ করতেন না। বরং তাদের ক্ষেত্রে ধরেই নেয়া হত, এরা যা বর্ণনা করেন মহানবী(সা.)-এর কাছ থেকে শুনেই তা বর্ণনা করেন।

আপত্তি : যেহেতু সহীহ হাদীসে আছে, ইমাম মাহদীর কাছে একটি কিতাব থাকবে যার মধ্যে ৩১৩ জন সাথীর নাম থাকবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী আজ পূরণ হল। *(রূহানী খাযায়েন ১১/৩২৪) আপত্তিকারীর আপত্তি হল, এই উক্তির ভিত্তি কী?*

উত্তর: মহানবী(সা.) বলেছেন, মাহদী এমন এক গ্রাম থেকে প্রকাশিত হবেন যার নাম কাদিয়া। আল্লাহ্ সেই মাহদীর সমর্থন করবেন এবং দূর দূরান্ত থেকে আল্লাহ্ তাঁর ভক্তদের একত্র করবেন তাদের সংখ্যা বদরের যুদ্ধের সংখ্যার সমান

হবে অর্থাৎ তিন শত তের হবে এবং তাদের নাম, ঠিকানা ও বৈশিষ্ট্যসহ ছাপা আকারে তার কাছে একটি বই থাকবে।
(হযরত শেখ আলী হামযা ইবনে আলী আল মালেক আত-তুসী রচিত জাওয়াহেরুল আসরার, কলমি নুসখা পৃষ্ঠা ৪৩)

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব! মির্যা সাহেব কোন ভিত্তিহীন কথা বলেন নি। আপত্তি করার আগে এসব গ্রন্থ একবার পড়ে নেয়ার প্রয়োজন ছিল। শুধু এই একটি গ্রন্থেই নয় আরো গ্রন্থে এই বর্ণনা রয়েছে। যেমন:

يجمع الله تعالیٰ له من اقاصی البلاد علی عدة اهل بدر ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا۔ معه صحيفة مختومة فيها عدد اصحابه باسمائهم و انسابهم و بلدانهم و طبائعهم و حلاهم و كناهم كدادون مجدون فی طاعته

'আল্লাহ তা'লা মাহদীর জন্য বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যার অনুরূপ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ৩১৩ জন সাহাবী একত্র করবেন এবং সেই মাহদীর কাছে একটি মুদ্রিত পুস্তক থাকবে যাতে এসব সাহাবীর নাম, ঠিকানা ও বৈশিষ্ট্য এবং বিবরণ লিখিত থাকবে। আর তারা তাঁর আনুগত্যে ক্রমাগত উন্নতি করতে সচেষ্ট থাকবে। (আল্লামা আলকুম্মি রচিত উয়ুনু আখবারির্ রিদা, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫; শেখ মুহাম্মদ বাকের আল মাজলিসী রচিত বিহারুল আনওয়ার খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১ বয়রুত থেকে প্রকাশিত)

আপত্তি : হাদীস শরীফে আছে, আদম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার বয়স ৭ হাজার বছর। (রূহানী খাযায়েন ১৭/২৪৫)

উত্তর: 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের আপত্তি হল, মির্যা সাহেব নাকি নিজের মনগড়া কথা কুরআন-সুন্নাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তার বইয়ের ভূমিকায় তিনি সাধারণ আহমদীরা এবং এ জামাতের মুরব্বীরাও হযরত মসীহে মাওউদ(আ.)-এর বইপুস্তক পড়ে নি বলে মন্তব্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজে হযরত মির্যা সাহেবের সমস্ত বই পড়েছেন, এবং পড়েছেন বলেই তাঁর লেখার বিষয়ে আপত্তি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তুলে দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন, এটি কোথায় উল্লেখ আছে? 'আল্লামা' যদি নিজে পড়ে আপত্তি করতেন তাহলে এমন প্রশ্ন তিনি কখনই করতে পারতেন না। দেখুন, যে পৃষ্ঠা

থেকে আপত্তি হিসাবে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হয়েছে ঠিক সেখানেই মির্যা সাহেব এর একাধিক রেফারেন্স নিজেই লিখে দিয়েছেন! এই সাত হাজার বছরের উল্লেখ হাকীম তিরমিযীর 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণিত হাদীস এবং 'তারীখে ইবনে আসাকির' গ্রন্থে হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণিত হাদীস দিয়ে বর্ণনা করেছেন। মির্যা সাহেব সেখানেই স্পষ্টভাবে এসবের বিশদ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতির বিষয়ে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী পাদটিকায় তিনি আলোচনাও করেছেন।[৪] 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ এ পৃষ্ঠাটি পড়েই যদি আপত্তি লিখে থাকেন তাহলে এ অবান্তর প্রশ্নটি তিনি কেন করলেন? আর যদি না পড়েই আপত্তি করে থাকেন তাহলে তার বইয়ের প্রারম্ভে তার আহমদীয়া সাহিত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করলেই তিনি ভাল করতেন।

আপত্তি : কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফসহ পূর্বেকার কিতাবে আছে যে, মসীহের যুগে একটি গাড়ী আবিষ্কৃত হবে যা আগুনের দ্বারা চলবে, সে গাড়ীটি হল রেল। *(রূহানী খাযায়েন ২০/২৫)*

উত্তর: মহানবী(সা.)-এর যুগে বিদ্যমান বিভিন্ন বাহনের উল্লেখ করার পর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

আর আমি তাদের জন্য এমনই আরও কিছু (বাহন) বানিয়েছি যাতে তারা আরোহণ করবে (সূরা ইয়াসীন: আয়াত ৪৩)। এমন আরও আয়াত পবিত্র কুরআনে রয়েছে যা দ্বারা বোঝা যায় ভবিষ্যতে অনেক আধুনিক যানবাহন আবিষ্কৃত হবে।

হাদীসে শেষ যুগের উল্লেখ করে সহীহ মুসলিমে একটি হাদীস সংকলিত হয়েছে আর তা হল,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا

৪. ১৩৪ ও ১৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ন্যায়বিচারক হয়ে আবির্ভূত হবেন এরপর তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শুকর বধ করবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করবেন। আর তখন উট পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে। একে কেউ বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে না অর্থাৎ এতে চড়ে সফর করবে না।

চিন্তা করে বলুন, মানুষ কখন একটি ব্যবহার্য জিনিষ পরিত্যাগ করে? এর উত্তর হল, কেবল তখনই যখন মানুষ এর চেয়েও উন্নততর কোন জিনিষ পেয়ে যায়। বিশ্বের উন্নত সব যানবাহন আজ সাক্ষ্য দিচ্ছে রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য, আজ ভ্রমণের জন্য উট পরিত্যক্ত হয়েছে। আবার শেষ যুগের আলামত হিসাবে যেসব হাদীসে দাজ্জালের উল্লেখ রয়েছে সেখানে দাজ্জালের একটি গাধার উল্লেখ আছে যা আগুন ও পানি খেয়ে চলবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কাছে স্পষ্ট, শেষ যুগের দাজ্জাল হল খ্রিস্টান পাদ্রী ও তাদের অনুসারীরা এবং তাদের প্রধান বাহন ছিল রেলগাড়ী যা এখনও আছে। অতএব মির্যা সাহেব পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকেই কথা বলেছেন। বিবেক খাটানোর শক্তি থাকলে সহজেই বুঝতে পারবেন।

আপত্তি : একটি হাদীসে আছে, শেষ যুগে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আবার আসবেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৮/৩৮৪, দ্র. টিকা)*

উত্তরঃ সূরা জুমআর প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 0وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

এটি একটি সূক্ষ্ম ভবিষ্যদ্বাণী (সূরা জুমুআ: ২-৪) ে বলা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে নিরক্ষর আরবদের মাঝে যাদেরকে তিনি আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে শুনাচ্ছেন, পবিত্র করছেন, তাদেরকে ধর্মের বিধি-বিধান ও এর ব্যাখ্যা শেখাচ্ছেন। যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, এবং তিনি তাকে প্রেরণ করবেন

তাদেরই অন্তর্ভুক্ত অন্য আরেক জাতির মাঝে যারা যুগের দিক থেকে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবু হুরায়রাহ্(রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা এই আয়াত শোনার পর প্রশ্ন করলাম, **'মানহুম ইয়া রাসূলাল্লাহ্'** এরা কারা যাদের মাঝে আপনি পুনরায় আসবেন? একবার প্রশ্ন করেও উত্তর পাওয়া যায় নি, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেও উত্তর পাওয়া যায় নি। তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে মহানবী(সা.) সকল আরব সাহাবীদের বাদ দিয়ে একমাত্র অনারব সাহাবী হযরত সালমান ফারসী(রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন,

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

অনুবাদঃ ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গিয়ে থাকলেও এদের এক বা একাধিক ব্যক্তি তা অবশ্যই নিয়ে আসবেন। (বুখারী শরীফ, কিতাবুত তফসীর)

রসূলে আকরাম(সা.) এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর সেই আগমনের অর্থ দৈহিক ও আক্ষরিক অর্থে আগমন নয়। বরং তাঁর এক শিষ্য তাঁর মাঝে বিলীন হয়ে আগমন করবেন। আর তাঁর আগমন মূলত রূপক অর্থে মহানবী(সা.)-এর আগমন হবে। তিনি ঈমানশূন্য যুগে আসবেন এবং পারস্য বংশীয় হবেন। 'আল্লামা' জানতে চেয়েছিলেন, মুহাম্মদ(সা.) পুনরায় আসবেন এটি হাদীসে কোথায় আছে? তাকে অনুরোধ করছি, বুখারী শরীফের কিতাবুত তফসীরের উপরোক্ত হাদীসটি দয়া করে দেখে নিবেন।

আপত্তি : মির্যা সাহেব লিখেছেন, পূর্বেকার নবীগণের কাশফ এই কথার উপর সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, তিনি (মির্যা সাহেব) চতুর্দশ শতাব্দির শুরুতে জন্ম নিবেন। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৩৭১)*

আপত্তি হল, রূহানী খাযায়েনের প্রথম এডিশনগুলোর মধ্যে "পূর্বেকার নবীগণ" (انبیاءگزشتہ) এই কথাটি ছিল। পরের মুদ্রণগুলোতে তা কেটে "পূর্বেকার ওলীগণ" (اولیاءگزشتہ) শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। আর এ পরিবর্তন করে কাদিয়ানী বন্ধুগণই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি অসত্য কথা লিখেছেন।

উত্তর: বিষয়টি মোটেও এমন নয় বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ স্থলে মির্যা সাহেবের জীবদ্দশায় প্রকাশিত এডিশনে 'আউলিয়ায়ে গুযাশতা' শব্দই ছিল কিন্তু পরবর্তী এডিশনে ভুলবশত 'আম্বিয়ায়ে গুযাশতা' মুদ্রিত হয়েছে।

হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন, ‘ইসলামের বর্তমান দুর্বলতা এবং শত্রুর ক্রমাগত আক্রমণ প্রয়োজন সাব্যস্ত করছে এবং পূর্ববর্তী আওলিয়াদের দিব্য-দর্শনও এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, সেই মহাপুরুষ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাবে আবির্ভূত হবেন।’

আসল কথা হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) আরবাঈন-২ বা অন্য কোন পুস্তকে এ বিষয়ে ‘আম্বিয়া গুযাশতা’ অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণ শব্দ লেখেন নি বরং ‘আউলিয়া গুযাশতা’ লিখেছেন। হযরত মির্যা সাহেবের যুগে মুদ্রিত আরবাঈনের দু’টি এ্যাডিশনে যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় ‘আউলিয়া গুযাশতা’ শব্দই মুদ্রিত আছে। হ্যাঁ নতুন এডিশনে যা ‘বুক ডিপো’ ছাপিয়েছে তাতে ভুলবশত: ‘আউলিয়ার’ স্থলে ‘আম্বিয়া’ শব্দ লেখা হয়েছিল। এটা মোটেও একজন আলেমের জন্য আপত্তি করার ভিত্তি হতে পারে না। হযরত মির্যা সাহেবকে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্(আ.) হিসেবে মান্য করি যাঁর আগমনবার্তা স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সা.) দিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব তাঁর লেখার মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি ঘটানো আর যাই হোক আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি ১৯৩০ সালেই বিরুদ্ধবাদী আলেমদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের জামাতের রেকর্ডে এ বিষয়টি সংরক্ষিত।

আপত্তি : মক্কা মদীনায় রেলের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। (রূহানী খাযায়েন ১৯/১০৮, ১৭/৪৯) তিন বছরে মক্কা মদীনায় রেলের রাস্তা তৈরি হবে। (রূহানী খাযায়েন ১৭/১৯৫)

জবাবঃ এটা অজ্ঞতাপ্রসূত একটি আপত্তি। ‘হিজায রেল’ একটি বাস্তব পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের নাম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সৌদী বাদশাদের অধীনে বর্তমান আরবের মূল অংশ তথা মক্কা-মদীনা পরিচালিত হত না বরং তুর্কি সুলতানের অধীনে মক্কা ও মদিনা পরিচালিত হত। তুর্কি সাম্রাজ্যের বিস্তৃত এলাকায়

‘হিজায রেল প্রকল্প’ একটি প্রধান প্রকল্প ছিল। তদনুযায়ী দামেস্ক থেকে হিজায পর্যন্ত নেরোগ্যাজ রেল লাইন বসানো হয়েছিল। এর পরবর্তী ধাপে মদীনা থেকে মক্কায় এর রেল লাইন বসানোর কথা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ১৯০২ সালে জানতেন, তুর্কি সাম্রাজ্য এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর মূল পরিকল্পনা তারও কয়েক দশক আগে। উসমানী রাজা তুর্কিস্তানী দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ এর আমলে ১৯০০ সালে হিজায রেলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখে রেললাইন মদিনা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছিল। তুর্কি সাম্রাজ্য আরবের উত্তরে অবস্থিত। এদের ক্ষমতা দামেস্ক হয়ে মদিনা ও মক্কা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। লরেন্স অব আরাবীয়া এই হিজায রেলকে স্থানীয় আরবদের সাহায্যপুষ্ট হয়ে বার বার আক্রমণ করত যার কারণে এর নিরাপত্তার সমস্যা ছিল সেই শুরু থেকেই। বিশাল অর্থ সংকটের কারণে তুর্কি বাদশাহ আব্দুল হামীদ শেষ পর্যন্ত এ ব্যয়বহুল কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন নি। ১৯২০ সালের পর এই প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়। শেষ যুগের লক্ষণাবলির মাঝে একটি লক্ষণ হল, দ্রুতগ্রামী বাহন আবিষ্কার হওয়া। সেই প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেব বলেছিলেন, এই লক্ষণ মক্কা মদিনায়ও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

‘আল্লামা’র অবগতির জন্য জানাচ্ছি, তুর্কি সরকারের প্রকল্প ভেস্তে গেলেও বর্তমান সৌদী সরকার আগামী কয়েক বছরের মাঝেই মক্কা-মদিনায় রেল সংযোগ চালু করার কাজ হাতে নিয়েছে। যদি তাদের তেল রপ্তানির বণিজ্য ঠিকভাবে চলে তাহলে একটু ধৈর্য রাখুন, হযরত মির্যা সাহেবের ১৯০২ সালের লেখার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাবেন। ‘হিজায রেলের’ একটি স্টেশন যা মদিনায় স্থাপিত হয়েছিল তার চিত্রটিও দেখে নিন।

আপত্তি : কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ধর্মযুদ্ধ হারাম। (রূহানী খাযায়েন ১৯/৭৫)
অথচ কুরআন বলছে: “তোমাদের উপর লড়াই ফরয করা হয়েছে।”كتب عليكم القتال(সূরা বাকারা ২১৬)

উত্তর: ‘আল্লামা’-র চমৎকার যুক্তি। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করেই চোখ বন্ধ করে ‘জেহাদ-জেহাদ’ বলে মানুষের মগজধোলাই করতে থাকাই কি মহানবীর ইসলাম? খোদাভীরু মুসলমানরা অনেক গভীরে গিয়ে ইসলাম পালন ও কুরআন

হাদীস চর্চা করে থাকেন। 'আল্লামা'-র উপস্থাপিত যুক্তির আলোকেই প্রশ্ন করছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন كتب عليكم الصيام তোমাদের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে (সূরা বাকারা: ১৮৪)। কিন্তু ব্যতিক্রম হিসাবে আল্লাহ্ তা'লা অসুস্থ এবং মুসাফিরদের উল্লেখ করেছেন। 'আল্লামা'! বলুন, অসুস্থ ও মুসাফির অবস্থায় কেউ কি রমজানে রোযা রাখতে পারে? আবার শর্ত হল, রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ। আমরা কি সেই ফরজ কাজটি রজব মাসে করতে পারি? প্রত্যেকটি ইবাদতের কিছু শর্ত রয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে কর্তিত দু' চারটি শব্দ তুলে দিয়ে সাধারণ মানুষকে ক্ষণিকের জন্য উস্কে দেয়া যায় কিন্তু প্রকৃত সত্যকে লুকানো যায় না। দেখুন, যাকাত আবশ্যক করা হয়েছে, আমরা কি নিঃস্ব, সর্বহারা অভাবীদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করতে পারি? যাকাত আদায় না করলে আমরা কি তাদের দোষারোপ করতে পারি? আবার দেখুন, নামাযকে ফরয করা হয়েছে। তাই বলে কি আমরা নিষিদ্ধ সময়ে সেই নামায আদায় করতে পারি? এ সবের উত্তর হল, না। যে জিনিষ যে শর্তে ফরয বা আবশ্যক করা হয়েছে সে শর্তেই সেই ফরয কাজ সম্পাদন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ফরযের ঘোষণা আছে এবং থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী এসব ইবাদতের বাস্তবায়ন নির্ধারণ করতে হবে। ঠিক এ নীতি অনুসারে মির্যা সাহেব সশস্ত্র যুদ্ধ করার জন্য পবিত্র কুরআনে যেসব শর্তাবলী রাখা আছে তার আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যেহেতু পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শর্ত পূর্ণ হয় না, তাই এ যুগে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ। যারা রাষ্ট্রদ্রোহিতাকে পবিত্র কুরআন বর্ণিত জিহাদ আখ্যা দিচ্ছে তারা চরম ভুল করছে। এ প্রেক্ষাপটে এ যুগে সশস্ত্র জিহাদ বৈধ নয়।

মির্যা সাহেব কেবল এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আত্মরক্ষামূলক সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য যেসব শর্ত রাখা আছে সেগুলো- এ যুগে এবং এই সরকারের ক্ষেত্রে পূর্ণ হয় না। তাই এ যুগে সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ নিষিদ্ধ। বিষয়টি কেবল এতটুকু। শর্ত প্রযোজ্য না হওয়ার কারণে শেষ যুগের মসীহ্ ও ইমাম মাহদী(আ.) যে যুদ্ধ রহিত করবেন তার ইঙ্গিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও জানা যায়। মহানবী(সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا وَحَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণিত হাদীসঃ মহানবী(সা.) বলেছেন, তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায়-মিমাংসাকারী ইমাম মাহদীরূপে দেখবে। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং ধর্মযুদ্ধ রহিত করবেন।' (মুসনদ আহমদ) মুসনাদ আহমদের উপরোক্ত হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, শেষ যুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ যুদ্ধ স্থগিত করবেন। কিন্তু আত্মশুদ্ধির জিহাদ, পবিত্র কুরআন প্রচার ও প্রসারের জিহাদ, কলমের জিহাদ, ধনসম্পদ ত্যাগের জিহাদ অব্যাহত আছে ও থাকবে। এতে চালাকি করে কেবল অস্ত্র-যুদ্ধ যে হারাম তা উদ্ধৃত করা হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে যে স্পষ্ট একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা 'আল্লামা' যেন বেমালুম ভুলে গেলেন!

আপত্তি : ১৮৫৭ সালে কুরআন আসমানে উঠানো হবে বলে কুরআনে বক্তব্য আছে। *(রূহানী খাযায়েন ৩/৪৯০, দ্র. টিকা)*

উত্তরঃ 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ খুব ভালভাবেই জানেন, কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি বাহ্যিক উপকরণের উল্লেখ করে আধ্যাত্মিক বা গভীরতর বিষয়ের অবতারণা করে। মুসলমানদের চরম অবক্ষয় প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলে রেখেছেন, আল্লাহ্ ঊর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন আবার তিনি সেই পানি উধাও করে দিতেও সক্ষম। এ কথার উল্লেখ তিনি এভাবে করেছেন, وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ এখানে বাহ্যিক পানির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক পানিরও উল্লেখ রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন মুসলমানদের জন্য এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। এ আয়াতেরই 'হুরূফে আবজাদের' (আরবী অক্ষরগুলোর সংখ্যমান) হিসেবে ১৮৫৭ সনটি নিরূপিত হয়।

যে কুরআন হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সেই কুরআনকেই পুনর্বাসিত করার জন্য, এবং অবক্ষয়ের পর মুসলমানদেরকে পুনর্জীবিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা আল কুরআনের মর্ম ও তত্ত্ব উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন। এছাড়া 'আল্লামা' নিশ্চয়ই জানেন মহানবী(সা.) ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীকে সর্বোত্তম শতাব্দী বলে উল্লেখ করেছেন। আবার সূরা সাজদার প্রথম রুকুতেই বলে রেখেছেন, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এমন এক দিনে জগৎ থেকে উঠে যাবে যা মানুষের গণনায় এক হাজার বছরের সমান। ৩০০+১০০০ = ১৩০০। অর্থাৎ

১৩০০ হিজরী সনে ইসলাম চরম দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় থাকবে। আর এটি ১৮৫৭ সনের অনতিবিলম্ব পরের যুগ।

যখন ইসলামের এহেন চরম দুর্দশা তখন إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা এই যিকর তথা কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হেফাজত করব। (সূরা হিজরঃ আয়াত ১০) এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহান সংস্কারক পাঠিয়ে আল্লাহ ইসলামের শিক্ষাকে পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ তো মির্যা সাহেবের বই পড়ে আপত্তি লিখেছেন। মির্যা সাহেব কোন হিসাবে ১৮৫৭ সন নির্ধারণ করেছেন তা উদ্ধৃত টিকার মাঝেই লেখা আছে।[৫] পাঠকের কাছে স্পষ্ট, 'আল্লামা' স্বপ্রণোদিত হয়ে এসব আপত্তি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন।

আপত্তি : 'আল্লামা'র প্রথম আপত্তি হল, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) লিখেছেন, 'যেহেতু সে চতুর্থ সন্তান তাই ইসলামী চতুর্থ মাস সফরে জন্ম নিয়েছে। আর সপ্তাহের চতুর্থ দিন অর্থাৎ বুধবার জন্ম নিয়েছে। (রুহানী খাযায়েন ১৫/২১৮) এই লেখাতে তিনি ইসলামী বছরের দ্বিতীয় মাস সফরকে চতূর্থ মাস লিখে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

উত্তরঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর জ্ঞানের ব্যাপারে যিনি প্রশ্ন করেছেন তার জ্ঞানের বহর কতটুকু আমরা তারও পর্যালোচনা করতে পারি। বিষয়টি কেবল 'সাব্কাতে কলম' অর্থাৎ কলম ফসকে একটি ভুল লেখা ছাপার ঘটনা। এটি মানবীয় ত্রুটি যা লিপিকার অথবা মুদ্রণ প্রমাদজনিত কারণে হয়ে থাকতে পারে। 'সফর মাসের ৪র্থ দিনে জন্ম নিয়েছে' লেখার স্থলে মুদ্রণ প্রমাদে '৪র্থ মাস সফর' ছাপা হয়েছে। বিষয়টি কেবল এতটুকু।

আরও মজার বিষয় হল, উক্ত পুস্তকের উদ্ধৃত বাক্যের ঠিক তিন পৃষ্ঠা পরই সঠিক বাক্যটি লেখা রয়েছে। অর্থাৎ রুহানী খাযায়েন ১৫শ খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "খোদা তা'লা আমার সত্যায়নে এবং বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য এবং আব্দুল হক গযনবীকে সতর্ক করার নিমিত্তে চতুর্থ পুত্র সন্তানের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৪ই জুন, ১৮৯৯ মোতাবেক, ৪ঠা সফর ১৩১৭ হিজরী সনে

পূর্ণ হয়েছে।” অতএব ২১৮ পৃষ্ঠার লেখাটি মুদ্রণ প্রমাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ‘আল্লামা’ ২১৮ নম্বর পৃষ্ঠা পড়ে আপত্তি করেছেন তিনি এর ২২১ পৃষ্ঠাটিও নিশ্চয়ই পড়েছেন। এই পৃষ্ঠায় বক্তব্যটি স্পষ্টভাবে লেখা আছে দেখেও ‘আল্লামা’র এমন আপত্তি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কি হতে পারে? ‘আল্লামা’ আপত্তি করেছেন যে সকলেই জানে সপ্তাহের চতুর্থ দিন মঙ্গল বার। কিন্তু মির্যা সাহেব চতুর্থ দিন হিসেবে বুধবার লিখেছেন। ‘আল্লামা’র এ কথা নিশ্চয়ই জানা আছে আরবী বা ইসলামী ক্যালেন্ডারে ইয়াওমুল আরবাআ (চতুর্থ দিন) বলতে বুধবারকেই বুঝায়। যে কথা আরবীতে বলা হয়- এ কথারই শাব্দিক অনুবাদ মির্যা সাহেব নিজে করেছেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু বনিয়ে বলেন নি। যুগ ইমামের বিরুদ্ধে কলম ধরলে এভাবেই লজ্জিত হতে হয়।

আপত্তিঃ হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন, ঐতিহাসিকগণ জানেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ঘরে এগারজন পুত্র জন্মেছিল। যারা সকলেই মারা গিয়েছিল। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/২৯৯)*

উত্তর: ইতিহাসের গ্রন্থাবলী পবিত্র কুরআনের সমান মর্যাদা রাখে না। পবিত্র কুরআনের মত এগুলো সব ধরনের ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্তও নয়। মির্যা সাহেবের যে উদ্ধৃতিটি এখানে ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ সাহেব উল্লেখ করেছেন এখানে মির্যা সাহেব ঐতিহাসিকদের প্রতি আরোপ করে কথাটি বলেছেন। এখন প্রশ্ন হল, কোন ইতিহাস গ্রন্থ কি মহানবী(সা.)-এর এগারো পুত্র সন্তানের নাম উল্লেখ করে? মহানবী(সা.)-এর জীবন চরিত সমৃদ্ধ অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোন কোনটি প্রসিদ্ধ ও অধিক প্রচলিত আবার কোনটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জনগণ অনবহিত। প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থ ‘সিরাতে হালাবিয়্যাহ্’-এর মাঝে ‘আওলাদুন্নাবী’ তথা ‘মহানবী(সা.)-এর সন্তানসন্ততি’ শিরোনামে একটি পৃথক পরিচ্ছদ রয়েছে। সেখানে মহানবী(সা.)-এর পুত্রসন্তান হিসাবে ১১টি নাম দেখতে পাওয়া যায়।[৬] অতএব যে কথা সীরাত গ্রন্থে বিদ্যমান মির্যা সাহেব কেবল সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এখন যদি কেউ সেই সীরাত গ্রন্থ পড়ে না থাকে তাহলে আমরা কী করতে পারি? কিন্তু পাঠক ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ দেওবন্দী

মতবাদের আলেম হয়ে সীরাতে হালাবীয়্যাহ পড়েন নি এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তাহলে জেনেশুনে তার এমন আপত্তি করার দুরভিসন্ধিটা কী?

আপত্তি : মির্যা সাহেবের বক্তব্য হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একজন ইয়াতীম সন্তান ছিলেন, যার জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবা ইন্তেকাল করেন। *(রূহানী খাযায়েন ২৩/৪৬৫)*

উত্তর : উপরোক্ত আপত্তি করে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ বলেছেন, আমাদের দেশের ছোট বাচ্চাও জানে মহানবী(সা.)-এর জন্মের পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেছেন। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ! যে জ্ঞান বাচ্চাদেরও আছে সেটাকে পাণ্ডিত্য বলে না। বুৎপত্তি লাভ ও বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। বাচ্চাদের জ্ঞানকে আল্লামা নিজের পাণ্ডিত্য হিসাবে উপস্থাপন করছেন এটা সত্যিই হতাশাজনক। 'আল্লামা' অনেক কষ্ট করে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ঘেঁটে এ কয়টা আপত্তি বের করেছেন কিন্তু আমরা 'আল্লামা'কে তার উত্থাপিত কোন আপত্তিতে খুশি করতে পারছি না বলে দুঃখিত। মির্যা সাহেব যে কথা বলেছেন তা যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ নিচে দেয়া হল।

একাধিক হাদীস সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মদ(সা.)-এর জন্মের পর ইন্তেকাল করেছেন। কেউ বর্ণনা করেছেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে সাত মাস পর, কেউ বলেছেন, পনের মাস পর, কেউ বর্ণনা করেছেন আটাশ মাস পর। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ ও সিরাত বিশ্বকোষ খুলে দেখুন সেখানেও একথাই সম্ভাব্য সকল উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে। (সীরাত বিশ্বকোষঃ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত)[৭]

'আল্লামা'র এসব আপত্তি করার আগে পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট আদেশ মান্য করা উচিত ছিল। তাহলে তাকে এমনভাবে লজ্জা পেতে হত না। আল্লাহ্ তালা পবিত্র কুরআনে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! যদি কোন ফাসেক ব্যক্তিও তোমাদের কাছে কোন সংবাদ বা তথ্য নিয়ে আসে তোমরা তা যাচাই বাছাই করে দেখে নিও (সূরা

হুজুরাত: ৭)। একটু ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি কষ্ট করে খুঁজে দেখলে আমাদেরকে আর এভাবে লিখতে হত না আর 'আল্লামা'কেও লজ্জিত হতে হত না।

যদি না জেনে কেউ এমন আপত্তি করে থাকে তার উচিৎ ইতিহাস পড়ে জেনে নেয়া। আর কেউ যদি জেনেশুনে বিভ্রান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য একাজ করে থাকে তাহলে এর বিচার আল্লাহ করবেন।

আপত্তিঃ মির্যা নাকি হিন্দুদের উপাস্যকে জঘন্য অশ্লিল ভাষায় উল্লেখপূর্বক হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলেন যার কারণে তারা রসূল(সা.) অবমাননায় উঠেপড়ে লেগেছিল। এরই ফলে নাকি হিন্দুরা 'রঙ্গিলা রসূল' নামে বই রচনা করেছে!

জবাবঃ সুধী পাঠক, নকল করতেও বুদ্ধি লাগে। একইভাবে মিথ্যা কথা বলতেও মৌলিক সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। যেভাবে 'আল্লামা' বলেছেন, ঘটনা আদৌ সেভাবে ঘটে নি। যার ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আছে সে জানে,'রঙ্গিলা রসূলের' লেখক ১৯২৪ সালে এই জঘন্য পুস্তিকা রচনা করে এবং এর ফলে মুসলমানদের আবেগ অনুভূতিতে চরম আঘাত লাগে এবং একজন বিভ্রান্ত মুসলমান সেই আবেগ সহ্য করতে না পেরে তাকে হত্যাও করে ফেলে। পাঠক, মির্যা সাহেব ১৯০৮ সালে ইন্তেকাল করেন আর 'রঙ্গিলা রসূল' লেখা হয় ১৯২৪ সালে। অতএব ইতিহাস প্রমাণ করে মির্যা সাহেবের লেখার প্রতিক্রিয়ায় আদৌ'রঙ্গিলা রসূল'-এর রচনা হয় নি। এটি ইসলাম বিদ্বেষীদের পরবর্তী সময়ের অপকর্ম। অতএব 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের ইতিহাস বিষয়ে পাণ্ডিত্য এখন সর্বজন বিদিত!

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, যে বিষয়টি অপরাধ হিসেবে হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি আরোপ করা হয়েছে সেটি আদৌ মির্যা সাহেবের কথাই নয়। বরং এই কুরুচীপূর্ণ বিশ্বাস আর্য-সমাজীরাই লালন করত। একথাই মির্যা সাহেব লিখেছেন। মির্যা সাহেব একাধারে আর্যদের অযৌক্তিক বক্তব্য খণ্ডন করে শেষে এসে বলেছেন, 'অত্যন্ত নোংরা ও লজ্জাকর একটি শিক্ষা তারা লালন করে আর তাদের সেই শিক্ষা হল, পরমেশ্বর নাকি নাভির দশ আঙ্গুল নীচে অবস্থিত' (রূহানী খাযায়েন, চশমায়ে মারেফাত পৃষ্ঠা-১১৪)।

যেস্থলে মির্যা সাহেব নিজে বলছেন এটি লজ্জাকর ও নোংরা একটি বিশ্বাস সেক্ষেত্রে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব কীভাবে এটিকে তাঁর বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপন করতে পারেন? এটি প্রকাশ্য খেয়ানত বই কিছুই নয়।

'আল্লামা' বিষয়টির সত্যাসত্য জানেন না এটা সঠিক নয়। তিনি বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ আলেম, উর্দূ আরবীর জ্ঞান রাখেন। তিনি নিশ্চয় পড়েই আপত্তি করেছেন। তাই এই চাতুরী থেকে বোঝা যায় তিনি তার পূর্বসূরিদের মতই জনগণকে উস্কে দেয়ার জন্য এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এমন আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

আপত্তি : 'আহমদী বন্ধু' পুস্তিকার ২৯ পৃষ্ঠায় 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ মির্যা সাহেবের গালি গালাজ শিরোনামে বিশদ তালিকা তুলে ধরে আপত্তি করেছেন।

উত্তর : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই শত্রুদের পক্ষ থেকে অপবাদ আরোপ করা হয় তিনি নাকি তার বিরুদ্ধবাদিদেরকে জঘন্য গালাগালি করেছেন। এরপর তারা একটি লম্বা তালিকা তুলে ধরে এর মাধ্যমে জনগণকে উসকানি দিয়ে থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে যতবার এসব জঘন্য মিথ্যা অপবাদের যৌক্তিক উত্তর প্রদান করা হয় ততবারই তারা সেই সমস্ত যুক্তি এড়িয়ে গিয়ে আক্ষরিক ও শাব্দিক অর্থে সেই শব্দগুলোকে নিজেদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে। এ বিষয়ে আলোচ্য বইতেও আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এ স্থলে আমরা সচেতন পাঠকের কাছে একটি ভিন্ন আঙ্গিকে এর উত্তর তুলে ধরছি যাতে সমাজে গোলযোগ ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের মুলোৎপাটিত হয়।

কঠোর-বাক্য ব্যবহার সম্পর্কে মির্যা সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন,
'গালিগালাজ এক জিনিষ আর প্রকৃত ঘটনার বিবরণ– তা যতই অপ্রিয় ও তিক্তই হোক না কেন, আরেক জিনিষ। প্রত্যেক সত্যবাদী ও সত্য বর্ণনাকারীর আবশ্যক দায়িত্ব হল, সত্য বক্তব্যকে প্রত্যেক উদাসীন বিরুদ্ধবাদীর কর্ণগোচর করানো। সেই বিরুদ্ধবাদী সত্য কথা শুনে অসন্তুষ্ট হলে হোক' *(রূহানী খাযায়েন খণ্ড-৩, ইযালায়ে আওহাম: পৃষ্ঠা ২০)।* এ ধরনের উদাহরণ তথা সত্যের বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কুরুচীপূর্ণ মানুষ সেগুলোকে বক্র দৃষ্টিতে দেখে আর খোদাভীরুরা এসব বক্তব্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের প্রকাশ দেখে

ঈমানে আরও বলিয়ান হয়ে নিজেদের দোষত্রুটি দূর করতে এবং প্রকৃত মুসলমান হতে চেষ্টা করে।

কুরআন শরীফ পবিত্র গ্রন্থ এ বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ নেই। এই পবিত্র কুরআনের সূরা বাইয়্যেনার ৭ নম্বর আয়াতে কাফেরদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أُولَـٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ অর্থাৎ 'এরাই নিকৃষ্টতম জীব'। পাঠকবৃন্দ, ভাল করে চিন্তা করে দেখুন 'শার্‌রুল বারিয়্যা' অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, সব সৃষ্ট জীবের মাঝে নিকৃষ্টতম। 'নিকৃষ্টতম জীব' বলে যত নিকৃষ্ট ও নোংরা জীব-জন্তু ও নোংরা মানুষ রয়েছে তাদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তাহলে কাফেরদেরকে কোন ভাষায় মূল্যায়ণ করা হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন? মহানবী(সা.) মিশকাত শরীফের একটি বিখ্যাত হাদীসে শেষ যুগের লক্ষাণাবলী উল্লেখ করার পর সে যুগের আলেম-উলামাদের সম্পর্কে বলেছেন,

علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود

তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে।" *(মিশকাত, কিতাবুল ইলম)*।

এই হাদীসে 'শার্‌রুম মান তাহ্‌তা আদীমিস সামা' বলার পর পৃথিবীর বুকের কোন নোংরা জীব বা নিকৃষ্ট মানুষ এর আওতা বহির্ভূত থাকে কি? এই পরিচ্ছদে মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেবের প্রধান আপত্তি হল, মির্যা সাহেব শেষযুগের আলেম-উলামাদের গালি দিয়েছেন। পাঠকবৃন্দ, মির্যা সাহেব নিজের থেকে কোন গালি দেন নি বরং আমাদের প্রিয় রসূল(সা.) শেষযুগের আলেম-উলামাদের সম্পর্কে যা বলে গেছেন তারই ভাবানুবাদ করেছেন মাত্র। একইভাবে মহানবী(সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস কন্‌যুল উম্মালে বর্ণিত আছে,

تكون في أمتي فزعة فيصير الناس إلى علمائهم فإذا هم قردة وخنازير

অর্থাৎ 'আমার উম্মতে হঠাৎ বিরাট অস্থিরতা দেখা দিবে। মানুষ তখন তাদের আলেমদের শরণাপন্ন হবে কিন্তু তারা গিয়ে হঠাৎ দেখতে পাবে তারা শুকর ও বানরে পরিণত হয়েছে'। (কনযুল উম্মাল: ১৪শ খণ্ড, হাদীস নম্বর-৩৮৭২৭)

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। এটি মহানবী(সা.)-এর বাণী। এ হাদীসের যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করা হোক, শব্দগুলো কিন্তু স্পষ্ট।

অতএব যে অর্থে যে কথা কুরআনে বলা আছে আর যে কথা রসূলে আকরাম(সা.) বলে গেছেন সে কথাই হযরত মির্যা সাহেব যথাস্থানে সেগুলোর অনুবাদ করে দিয়েছেন মাত্র।

প্রত্যেক খোদাভীরু আলেমের দায়িত্ব সে যেন নিজের দিকে তাকিয়ে ইস্তেগফার করে যাতে সে রসুল(সা.)-এর এই সাবধান বাণীর আওতার্ভুক্ত না হয়।

গালিগালাজ সংক্রান্ত আপত্তি শেষে লানত প্রসঙ্গটি আবার টেনে এনেছেন 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ। এখন শুধু পাঠককে একটি বিষয় বলছি, লানত করা যে আল্লাহর সমীপে একান্ত মিনতি বা একটি দোয়া তা 'আল্লামা' বেমালূম ভুলে গেছেন। 'আল্লামা'র মত হল, লানত করলে নাকি নবী হতে পারে না। তিনি ভুলে গেছেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ

বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মুখে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আর এমনটি করার কারণ হল, তারা অবাধ্যতা করেছিল এবং ক্রমাগতভাবে তারা সীমালজ্ঘন করছিল *(সূরা মায়েদা: ৭৯)*। তাহলে, বনী ইসরাইলের এই দুই নবী লানত করার কারণে কি 'আল্লামা' মজিদের দৃষ্টিতে আর নবী নন? লা'নত তথা আল্লাহ্ তা'লার কাছে মিনতি করা আল্লাহ্র শিক্ষা পরিপন্থী নয় বরং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার একটি মাধ্যম। শুধু 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ কেন, সাধারণ আলেম মাত্রই এ বিষয়টি জানেন। আর হাজার লানতে 'আল্লামা'র আপত্তির উত্তর এই পুস্তকে পৃথক একটি অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে, দয়া করে পড়ে নিন।

'আল্লামা' সাহেব তার রচিত আহমদী বিরোধী পুস্তিকায় প্রধানতম আপত্তি হিসাবে মির্যা সাহেব সম্পর্কে লিখেছেন তিনি নাকি অসংখ্য মুসলমানকে অকথ্য ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। বিশেষ করে তিনি নাকি 'যুররিয়াতুল বাগায়া' তথা **বেশ্যার সন্তান** অর্থে মুসলমানদেরকে গালি দিয়েছেন। (আহমদী বন্ধু: পৃষ্ঠা- ৮ ও ২৯)

প্রতিশ্রুত মসীহ্(আ.) যদি সত্যিই আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম গ্রন্থে মুসলমানদেরকে এই অর্থেই এমন গালি দিয়ে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি জঘন্য কাজ করেছেন এবং মুসলমানদের এতে ক্ষিপ্ত হবারই কথা।

কিন্তু যদি বিষয়টি এর উল্টো দাঁড়ায় তাহলে বুঝতে হবে বিরুদ্ধবাদীরা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। প্রত্যেক শব্দের অনুবাদ তার পূর্বাপর ও বিষয়বস্তুর আলোকে করতে হয়। যেখানে শাব্দিক অর্থে বিষয়টি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে তার গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে হয়। যেমন,**'ওয়া'তাসিমূ বিহাবলিল্লাহে জামীআ'**। তোমরা সবাই সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর। এখানে আল্লাহর রশি হিসাবে বাহ্যিক অর্থ করা সম্ভবই নয়। আল্লাহর রশি হিসেবে যদি আকাশ থেকে বাহ্যিক কোন দড়ি ঝুলানোও হয় আর একসাথে সব মুসলমান সেটিকে আঁকড়ে ধরতে চায় তাহলেও দশ বিশ জনের বেশি কেউ তা ধরতে পারবে না। অতএব এর তাৎপর্যপূর্ণ গভীর অর্থ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। আর তা হল, আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত আল-কুরআনকে বা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ(সা.)-কে অথবা যুগ-ইমামকে সবাই আঁকড়ে ধর। এছাড়া এর বাহ্যিক কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনিভাবে সূরা বাকারার একেবারে প্রারম্ভেই সত্য অস্বীকারকারীদের 'সুম্মুন বুকমুন উময়ুন' বলা হয়েছে- এতে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে বোবা, বধির বা অন্ধ বুঝানো হয় নি বরং আত্মিকভাবে বোবা, বোধির বা অন্ধ বলা হয়েছে। আমরা কেন এটিকে আত্মিকভাবে নিয়েছি? কেননা পূর্বাপর আমাদেরকে এর বাইরে যাবার অনুমতি দেয় না।

ঠিক একইভাবে, মির্যা সাহেব মুসলমানদের 'বেশ্যার বংশধর' বলে গালি দেন নি। 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' পুস্তক ১৮৯৩ সালের লেখা। এই বইতে তাঁর অস্বীকারকারী মুসলমানদের বেশ্যার বংশধর বলার প্রশ্নই ওঠে না। ১৮৯৩ সালে লেখা বইয়ে 'যুররিয়াতুল বাগায়া' মুসলমানদের গালি অর্থে দেয়া তো দূরের কথা বিষয়টি তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়নি।

'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে হযরত মির্যা সাহেব রাণী ভিক্টোরিয়াকে মুসলমান হবার আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন মুসলমানদের মনোস্তুষ্টি করতে। তাহলে, কীভাবে সেই একই গ্রন্থে মুসলমানদেরকে তিনি জঘন্য ভাষায় গালি দিতে পারেন?

জানা আবশ্যক, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) উক্ত বইয়ের আলোচ্য অংশে নিজের ইসলাম সেবার কথা তুলে ধরে বলেছেন: "আমার বয়স যখন ২০, তখন থেকেই আর্য সমাজীদের ও খৃষ্টানদের সাথে যুক্তিতর্কের মোকাবিলা করার ইচ্ছা আমার মনে সৃষ্টি হল। তদানুযায়ী আমি 'বারাহীনে আহমদীয়া,' 'সুরমা চাশমায়ে আরিয়া', 'ইযালায়ে আওহাম' এবং 'দাফেউল ওয়াসাওয়েস' প্রভৃতি পুস্তক রচনা

করি। এগুলো ইসলামের সমর্থনে লেখা। প্রত্যেক মুসলমান এই বইগুলোকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখে এবং এগুলোতে পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা উপকৃত হয় এবং তারা আমার ইসলামের দিকে আহবান করাকে সমর্থন দেয়। 'ইল্লা যুররিয়াতুল বাগায়া আল্লাযীনা খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ফাহুম লা ইয়াকবালূন'। 'যুররিয়াতুল বাগায়া' ছাড়া অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা ঈমান গ্রহণ করবে না (রুহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৮)। এখানে মির্যা সাহেব 'যুররিয়াতুল বাগায়া' অর্থ কি তা স্পষ্টভাবে বলেই দিয়েছেন। এরা হল তারা যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন।

হযরত মির্যা সাহেব যখন 'বারাহীনে আহমদীয়া' (ইসলাম ধর্মের পক্ষে দলিল-প্রমাণ সংবলিত) ও 'সুরমা চশমায়ে আরিয়া' (আর্য সমাজীদের অসারতা প্রমাণকল্পে) বই লিখলেন তখন আর্য সমাজীদের নেতা পেশাওয়ার নিবাসী পণ্ডিত লেখরাম উক্ত পুস্তিকাদ্বয়ের বিরুদ্ধে 'খাবতে আহমদীয়া' এবং 'তাকযীবে বারাহীনে আহমদীয়া' বই রচনা করে। এর প্রত্যুত্তরে দলমত নির্বিশেষে মুসলমানরা মির্যা সাহেবের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী হযরত মির্যা সাহেব লিখিত 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকের সমর্থনে একটি রিভিউ প্রকাশ করেন। একইভাবে লাহোরের মুসলিম বুক ডিপো নিজ খরচে মির্যা সাহেবের লেখা 'সুরমা চাশমায়ে আরিয়া' বইটি পুনঃমুদ্রন করে। আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে গাল দেয়ার অভিযোগ তিনি তার একই বইতে মুসলমানদেরকে রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য দোয়া করতে বলেছেন যেন রাণী মুসলমান হয়ে যান (রুহানী খাযায়েনঃ ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৬-৫২৭ পৃ) আবার ৫৩৫ পৃষ্ঠায় রাণীকে বলেছেন যে, হে রাণী ভিক্টোরিয়া! আপনি জেনে রাখুন, মুসলমানরা আপনার বিশ্বস্ত প্রজা। তাই আপনি তাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন এবং তাদের মনোস্তুষ্টির ব্যবস্থা করবেন।' বইয়ের ৫৪০ পৃষ্ঠায় নেক উলামাদের প্রশংসা করে লিখেছেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান অস্তিত্বের- যিনি আধ্যাত্মিক আলেমদের এবং মোহাদ্দেসীনদের নবীদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন এবং তাদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। যিনি রাণীকে মুসলমান হবার আহ্বান জানাচ্ছেন, যিনি মুসলমানদের মনোস্তুষ্টি করতে রাণীকে আহবান জানাচ্ছেন, যিনি আধ্যাত্মিক উলামাদের এত প্রশংসা করেছেন তিনি হঠাৎ তাদের এত জঘন্য ভাষায় গালি দিবেন– তা কেমন করে সম্ভব? যে ব্যক্তি হযরত মির্যা সাহেবের লেখা 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' বইটি মনোযোগ সহকারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পড়েছে সে এ জাতীয় কথা বলতেই পারে না।

এছাড়াও ‘যুররিয়াতুল বাগায়া’-র অনুবাদ ‘বেশ্যার বংশধর’ করা ঠিক নয়। কেননা মির্যা সাহেব তথা লেখক নিজেই এ শব্দের অর্থ ‘বিদ্রোহী মানুষ’ করেছেন। মৌলবী সা’দুল্লাহ লুধিয়ানীকে ‘আঞ্জামে আথম’ পুস্তকে তিনি ‘ইবনু বাগা’ বলে সম্বোধন করেন এবং নিজেই এর অনুবাদ করেন: ‘হে বিদ্রোহী মানুষ’ *(আল-হাকাম, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ সন)।*

অতএব ‘যুররিয়াতুল বাগায়ার’ অর্থ হল বিদ্রোহীদের সন্তান। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট মহাপুরুষকে যারা অমান্য বা অবজ্ঞা করে তারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী। এ বিষয়টিই তিনি আরবীতে উপস্থাপন করেছেন। প্রবাদ-প্রবচনে শাব্দিক অর্থ কখনও গ্রহণ করা হয় না বরং এর অন্তর্নিহিত একটি অর্থ থাকে। একথা সব ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আরবী জানা সব আলেমও এটি ভালভাবে জানেন। যেমন ‘ইবনুস সাবীল’ বলতে রাস্তার ঔরসজাত সন্তান বুঝায় হয় না বরং এ শব্দকে ‘পথিক’ বা ‘মুসাফির’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়। কেবল উন্মাদই‘ইবনুস সাবীল’-এর অর্থ ‘পথিক’ না করে ‘পথের ঔরসজাত সন্তান’ করবে। তাই এমন ব্যক্তি যে নিজেকে নিজে গালি দেয়ার শখ রাখে সে ছাড়া অন্য কেউ ‘যুররিয়াতুল বাগায়া’-র বিকৃত কোন অর্থ করবে না। আর লেখক যখন নিজের বক্তব্যে ব্যবহৃত কোন শব্দের অর্থ নিজেই করে দেন তখন কারও এতে অর্থ বিকৃতির অধিকার থাকে না। এর পরও যদি কেউ এর অর্থ ‘বেশ্যার বংশধর’ করেন তবে এটি অযথা নিজেকে নিজেই গাল দেয়ার মতো ব্যাপার হবে। মির্যা সাহেব এর জন্য দায়ী নন।

এখানে তার অপবাদের আরেকটি উদাহরণ তুলে ধরছি-
‘আল্লামা’ আপত্তি করেছেন, মির্যা সাহেব নাকি মৌলভী সা’দুল্লাহকে ‘হিন্দুর বাচ্চা’ বলে গালি দিয়েছেন।

পাঠকবৃন্দের জানা থাকা দরকার, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) মৌলভী সা’দুল্লাহ্ সম্পর্কে ‘হিন্দুযাদ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে ‘হিন্দুর ছেলে’। প্রকৃতপক্ষেই মৌলভী সা’দুল্লাহ লুধিয়ানী হিন্দু থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মৌলভী সা’দুল্লাহ্‌র পিতা হিন্দু ছিলেন। এখানে মির্যা সাহেব তার পিতৃপরিচয় তুলে ধরেছেন। কিন্তু এর অনুবাদ করতে গিয়ে ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ হিন্দুর ছেলে না বলে ‘হিন্দুর বাচ্চা’ বলে বিকৃতকরে একে গালিররূপ দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন।

‘আল্লামা’যদি এরপরও এসবকে কুরুচিপূর্ণ জঘন্য গালি বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তাহলে তার জন্য একটি শিক্ষনীয় ঘটনা তুলে ধরছি।

নিশ্চয় তিনি জানেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে সুহায়লের আগে মক্কার যে সব বড় বড় কাফের সর্দার হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এসে চুক্তি করতে উদ্যত হয় তাদের মাঝে একজন ছিল উরওয়া। উরওয়া তার আলোচনার এক পর্যায়ে সাহাবীদের ঈমান এবং তাদের দৃঢ়তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে বাজে মন্তব্য করে। তার এ কথায় পরোক্ষভাবে রসূলে করিম(সা.)-এর অবমাননাই নিহীত ছিল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.) সহ্য করতে না পেরে রসূলে করীম (সা.)-এর উপস্থিতিতে বলেছিলেন,

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ

অর্থাৎ তখন আবু বকর(রা.) তাকে বললেন, তুমি লাত দেবীর লজ্জাস্থান চেটে খাও। আমরা কি তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাবো? (বুখারী কিতাবুশ শুরুত; ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত হাদীস নম্বর ২৫৪৭)

এটাকি হযরত আবু বকর সিদ্দিক(রা.)-এর অশালীন চরিত্রের রূপ ছিল নাকি রসূলে করিম(সা.)-এর সম্মান রক্ষার্থে এবং তাঁর অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল? যে অর্থে হযরত আবু বকর(রা.) কড়া জবাব দিয়েছেন সেই একই অর্থে হযরত মির্যা সাহেবের বক্তব্যও প্রযোজ্য হতে পারে।

আমরা আশা করি, হযরত আবু বকর(রা.) এর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদা বিষয়ে ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ ও দেওবন্দীদের কোন সংশয় নেই। আমরা আশা করি, দেওবন্দী আলেম হিসাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর এই বক্তব্যটি আক্ষরিক অর্থে গালিগালাজ হিসাবে তারা নিবেন না বরং তাঁর আত্মাভিমান লক্ষ্য করে রসূলের সম্মান রক্ষাকারী হিসাবেই তাঁকে বিবেচনা করবেন।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) কী কারণে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন,
“বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লিখিত তর্কযুদ্ধের সময় আমার পক্ষ থেকে কিছুটা কঠোর বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কঠোরবাক্য ব্যবহারের সূচনা আমার পক্ষ থেকে হয় নি বরং এসব বক্তব্য চরম নোংরা আক্রমণের জবাবে লেখা হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীদের কথা এতই কঠোর ও নোংরা ছিল যার ফলে এর বিপরীতে

এতটুকু কঠোরবাক্যের প্রয়োজন ছিল। একথার প্রমাণ হিসাবে আমি আমার পুস্তকাদির কঠোর বাক্য এবং বিরুদ্ধবাদীদের কঠোরবাক্য পাশাপাশি 'কিতাবুল বারিয়্যাহ' পুস্তকে তুলে ধরেছি। সেই সাথে এটিও মনে রাখতে হবে, আমি এসব বাক্য প্রত্যুত্তরে ব্যবহার করেছি। কঠোরবাক্যের সূচনা বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে হয়েছিল। আমি চাইলে এসব নোংরা ভাষা শুনেও ধৈর্য ধারণ করতে পারতাম, কিন্তু দু'টি কারণে আমি তাদের উত্তর দেয়া সমীচীন মনে করেছি। প্রথমত, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কঠোরভাষার উত্তর কঠোর ভাষায় পেয়ে যেন নিজেদের আচরণ পরিবর্তন করে এবং ভবিষ্যতে যেন তারা শালীনতা বজায় রেখে আলোচনা করে। দ্বিতীয়ত, বিরুদ্ধবাদীদের চরম অবমাননাকর এবং উস্কানীমূলক এসব লেখার কারণে সাধারণ মুসলমানরা যেন উত্তেজিত হয়ে না যায় এবং কঠোরভাষার উত্তর কিছুটা কঠোর ভাষায় দেয়া হয়েছে দেখে যেন তারা নিজেদেরকে একথা ভেবে আশ্বস্ত করতে পারে, যাক কঠোর বাক্যের বিপরীতে কিছুটা হলেও কঠোর ভাষায় জবাব দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এভাবে যেন তারা বর্বরোচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে।" *(কিতাবুল বারিয়্যাহ, রূহানী খাযায়েন ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১ ও ১২)।*

আপত্তি : হযরত মসীহে মওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) অলীউল্লাহ (আল্লাহর ওলী) ছিল। আর (এই) আল্লাহর ওলী কখনও কখনও যিনা-ব্যভিচার করতেন। "কাদিয়ানীদের পত্রিকা আল-ফযলে ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮ সালের সংখ্যায় এক কাদিয়ানীর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। বর্ণনাকারী বলেছেন, হযরত মসীহে মওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) অলীউল্লাহ (আল্লাহর ওলী) ছিল। আর (এই) আল্লাহর ওলী কখনও কখনও যিনা-ব্যভিচার করতেন। যদি তিনি কখনও তা করেন তাতে অসুবিধার কী আছে? মসীহে মওউদের (মির্যা) উপর আমাদের কোন অভিযোগ নেই। কেননা তিনি কদাচিৎ ব্যভিচার করেন। আমাদের আপত্তি হচ্ছে, বর্তমান খলীফা (মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ) কে নিয়ে, যিনি সর্বদা যিনা করেন।"

উত্তর: নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক-আহমদীরা নাকি নিজেদের পত্রিকাতেই একথা অকপটে ঘোষণা করেছে, তাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদের দ্বিতীয় খলীফা নাকি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতেন। যারা সত্যান্বেষী খোদাভীরু পাঠক তাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আল-ফযল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মুখপত্র। এর প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ সালে। সেই পত্রিকায় আহমদীরা কীভাবে এরকম জঘন্য বিষয় স্বীকারোক্তি আকারে প্রকাশ করতে পারে? কোন আধ্যাত্মিক জামা'ত তো দূরের কথা, জগতের বস্তুবাদিতার মোহে আক্রান্ত লোকেরাও এমন নির্লজ্জতা দেখাতে সাহস পায় না। বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন বিদ্বেষী ও বিরোধী ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জামা'তের বিরোধিতায় কত জঘন্য অপবাদ আরোপ করতে পারে তার উপমা দিতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন আহমদ(রা.) এক ব্যক্তির উল্লিখিত মিথ্যা অপবাদ উদাহারণস্বরূপ তুলে ধরেছিলেন । শত্রুর বক্তব্য তুলে ধরে তিনি যা বলেছেন সেটা আল-ফযলে ছাপা হয়েছিল। হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.) এই উদ্ধৃতি তুলে ধরে এর মূল্যায়ন করে বলেন, এ ব্যক্তি বাহ্যত যদিও আমার বিরোধিতা করছে কিন্তু তার বিরোধিতা মূলত আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে। তার কথার কোন ভিত্তি নেই। যদি কারও ক্ষেত্রে ব্যভিচারী হওয়া প্রমাণিত হয় সে কি কখনও সাধু পুরুষ হতে পারে? সম্পূর্ণ বিষয়টিকে পূর্বাপর উল্লেখ না করে বিকৃত ও খণ্ডিত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর ১৯৩৮ এ প্রকাশিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধী এক আপত্তিকারীর আপত্তিটিকে নকল করে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ তা পুনরায় আপত্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন। মহানবী(সা.) এ ধরনের বাজে কথা

ছড়াতে নিষেধ করে বলেছেন: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বলে বেড়ায়।
পাঠকদের অবগতির জন্য কয়েকটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য এখানে তুলে দিচ্ছি, যা দ্বারা হযরত মির্যা সাহেবের নিষ্কলুষ জীবনচরিত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ উপমহাদেশের একজন সর্বজনবিদিত প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তিনি ১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে হযরত মির্যা সাহেবের মৃত্যু পর, শোক প্রকাশ করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর এই লেখা ১৯০৮ সালের ২০শে জুন তারিখে পাঞ্জাবের 'উকিল' পত্রিকায় (অমৃতসর থেকে) প্রকাশিত হয়। মওলানা আজাদ লিখেছেন:

'তিনি (অর্থাৎ হযরত মির্যা সাহেব) এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর লেখা এবং কথায় যাদু ছিল। তার মস্তিষ্ক ছিল এক মূর্তিমান বিস্ময়। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয়-স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় বিপ্লব সংঘটিত হত। তাঁর দু'টি মুষ্ঠি বৈদ্যুতিক ব্যাটারির মত ছিল। তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ ধর্মজগতে মহাপ্রলয় ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয়-বিষাণ হয়ে ঘুমন্তদেরকে জাগিয়ে তুলতেন। তিনি আজ জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি যেরূপ বিজয়ী সেনাপতির কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য, যে মহান আন্দোলন আমাদের শত্রুদেরকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করে রেখেছিল তা যেন ভবিষ্যতেও চলমান থাকে। খৃষ্টান এবং হিন্দু আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যেসব পুস্তক রচনা করেছেন, তা সর্বসাধারণের মাঝে সমাদৃত। ...'

'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী জাফর আলী খান সাহেবের পিতা **মৌলভী সিরাজ উদ্দিন সাহেব** হযরত মির্যা সাহেবের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন:
'মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে শিয়ালকোট জেলায় চাকুরীরত ছিলেন। তখন তার বয়স ২২/২৩ বছর হবে। আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি যৌবনে একজন খুবই নেক এবং খোদাভীরু বুযুর্গ ছিলেন।' (জমিদার পত্রিকা, ৮ জুন ১৯০৮)

অমৃতসর থেকে প্রকাশিত **'উকিল'** পত্রিকার সম্পাদক **মওলানা আব্দুল্লাহ্ আল এমাদী নিজ পত্রিকায় লিখেন:** 'চরিত্রগত দিক থেকে মির্যা সাহেবের আঁচলে

একটি ক্ষুদ্র দাগও দৃষ্টিগোচর হয় নি। তিনি এক পূতঃপবিত্র জীবন যাপন করেছেন' (উকিল পত্রিকা, ৩০ মে ১৯০৮)।

যারা মির্যা সাহেবকে কাছ থেকে দেখেছেন, যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তারা তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে, তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তাঁর চরিত্র ও জীবন সম্পর্কে নিজেরা স্বেচ্ছায় এসব মন্তব্য করেছেন। অতএব 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের অপবাদগুলো মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য এসব উদ্ধৃতি যথেষ্ট।

আপত্তিঃ মির্যা কাদিয়ানী সাহেবের বাসায় মুসাম্মত ভানু নামে এক মহিলা কাজ করত, তাকে দিয়ে রাতে পা টিপাতেন (সীরাতুল মাহদী, ১/৭২২ মির্যা বশীর আহমদ এম. এ. কৃত)।

উত্তরঃ মুসাম্মত ভানু মির্যা সাহেবের বাড়ির এক প্রবীণ বৃদ্ধা বুয়া ছিলেন যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সে বাড়িতে কাজ করেছেন। মির্যা সাহেবের স্ত্রী-সন্তানের উপস্থিতিতে ভক্তির আতিশয্যে তিনি একবার মির্যা সাহেবের পা টিপতে যান এবং পা না টিপে লেপের উপর দিয়েই খাটের কাঠ টেপা শুরু করেন। বুড়ির এ কাণ্ড দেখে মির্যা সাহেব হাসতে থাকেন। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব যেখান থেকে উদ্ধৃতিটি নকল করেছেন সেই পুরো উদ্ধৃতিটি তুলে ধরলেই পাঠকের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যেত।

আলোচ্য ৭৮০ নম্বর বর্ণনাটির পূর্ণ বিবরণ হল, ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব তাঁর বোন হযরত মসীহে মাওউদ(আ.)-এর স্ত্রী সৈয়দা নুসরত জাহান বেগম(রা.)-এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, "হযরত মির্যা সাহেবের বাড়িতে মোসাম্মত ভানু নামে এক বুড়ি কাজের বুয়া ছিল। সেই বুড়ি এক প্রচণ্ড শীতের রাতে হুযূরের পা টেপার জন্য বসল। যেহেতু এই বুড়ি লেপের ওপর দিয়েই পা টিপছিল তাই সে বুঝতে পারে নি, সে যা টিপছে তা পা নয় বরং খাটের পট্টি। কিছুক্ষণ পর হযরত মির্যা সাহেব বললেন, ভানু! আজ অনেক শীত পড়েছে, তাই না? (ভানু পা না টিপে খাটটির ফ্রেমের কাঠ টিপছিল তাই সেদিকে ইঙ্গিত করছিলেন)। ভানু উত্তরে বলল, 'হ্যা, ভীষণ শীত পড়েছে, দেখুন না আপনার পা কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে!' ...ভানু কাদিয়ানের নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী এবং নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক মহিলা ছিল।"

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ যদি পুরো উদ্ধৃতিটুকু পড়তেন তাহলে এমন আপত্তি করতেই পারতেন না। পুরো বিবরণটিতে দেখা যাচ্ছে, হযরত মির্যা সাহেবের পরিবার সেখানে উপস্থিত আর স্বয়ং তাঁর স্ত্রী হাসির গল্প হিসেবে এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। আর মোসাম্মত ভানু এমনই বয়স্ক একজন বুড়ি যে খাটের খুটি আর মানুষের পা–এর মাঝেও পার্থক্য করতে পারে না! বাড়ির বুয়া দীর্ঘদিন কাজ করতে করতে বাড়ির সাধারণ সদস্যদের মতই আচরণ করে। নবী-রসূলদের আল্লাহ্ তা’লা সাধারণ মানুষের তুলনায় ভিন্ন ও অনেক উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা দান করে থাকেন।

যদি মজিদ সাহেবের মন এতেও প্রশান্ত না হয় সেক্ষেত্রে আমরা বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত উবাদা বিন সামেতের স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত হাদীসঃ রসূলুল্লাহ্(সা.) উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের গৃহে যেতেন। তিনি ছিলেন হযরত উবাদা বিনতে সামেত(রা.)-এর স্ত্রী। একদিন তিনি(সা.) তাঁর কাছে এলেন তখন তিনি তাঁকে খাবার খাওয়ালেন। এরপর সে তাঁর(সা.) মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন। রসূলুল্লাহ্(সা.) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণপর হেসে হেসে জেগে উঠলেন .. *(বুখারী কিতাবুর রু’ইয়া বাবুর রু’ইয়া বিন্‌নাহার; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারী শরীফ ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩৮, হাদীস নম্বর- ২৯৪০)*।

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ এক্ষেত্রে কি রসূল(সা.)-এর চরিত্র নিয়েও আপত্তি তুলবেন? নাউযুবিল্লাহ। ‘আল্লামা’! এখানে আপত্তির কিছু নেই। কেননা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের আল্লাহ্ তা’লা সাধারণ মানুষের তুলনায় ভিন্ন ও অনেক উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা দান করে থাকেন। তবে হ্যাঁ, জগতে কিছু এমন প্রকৃতির মানুষও আছে যারা অনেক ইতিবাচক বিষয়কেও নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এবং ধর্মশিক্ষকদের কাছ থেকে ধর্মকর্ম না শিখে উল্টো তাঁদেরকে শেখাতে উদ্যত হয়।

আপত্তিঃ যিকরে হাবীবের বরাতে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব আপত্তি তুলেছেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বলেছেন, সিনেমা দেখতে একবার আমিও গিয়েছিলাম।

উত্তর : চলুন পাঠকবৃন্দ, মূল শব্দটি কি তা দেখে আসি। হযরত সাহেব বলেছেন, 'আমি একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে কী হয় তা দেখতে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করা যায়।' 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ থিয়েটারের অর্থ করেছেন সিনেমা এবং অবশিষ্ট অংশ গোপন করেছেন যা মির্যা সাহেব তার বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। তিনি সেখানে অশ্লিলতার জন্য যান নি বরং সেখানে কী দেখানো হয় তা দেখার জন্য এবং সেখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আহরণ করতে গিয়েছিলেন। হযরত মির্যা সাহেবের এই আচরণ তাঁকে আধুনিক প্রগতিশীল মানসিকতা সম্পন্ন একজন মানুষ সাব্যস্ত করে। তিনি নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিকে ইসলাম সেবায় নিয়োজিত করার মানসিকতা রাখতেন। গণমাধ্যমের নতুন নতুন উপকরণ ব্যবহার করে কত দূর ও কত দ্রুত ইসলামের খাঁটি শিক্ষা পৌঁছানো যায় সেটিই ছিল তার চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু।

'আল্লামা' ইউরোপীয় অশ্লিলতার ব্যাধি অবলোকনের বিষয়টিকে অভিযোগ আকারে তুলেছেন দ্বিতীয় খলীফার বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ বক্তব্যটি হযরত মীর্যা বশীর আহমদ সাহেবের। এবং এটিও ১৯৩৪ সালে আল-ফযলে ছাপা হয়েছে। 'আল্লামা'র নিশ্চয় জানা আছে, **'আল-ইসমু মা হাকা ফী নাফসিকা'** দ্বিতীয় খলিফা সাহেবের মনে যদি সামান্যতম পাপ থাকত তাহলে কি তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে একথার উল্লেখ করতেন, তা-ও আবার জামা'তের মুখপত্রে? আল-ফযলে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করার অর্থই হচ্ছে, এই পরিদর্শনের পেছনে তাদের মনে কোন পাপ ছিল না। তার অবলীলায় অকপটে এরূপ বলা প্রমাণ করে তিনি নেক উদ্দেশ্যে কাজটি করেছিলেন।

বরং এটি তাঁর পবিত্র চেতা ও মুসলেহ মাওউদ প্রতিশ্রুত সংস্কারক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। কেননা তিনি তাদের গাউন পরাকেই নগ্নতা আখ্যা দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কুরআনের سِيرُوا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন কর' নির্দেশ অনুসারে ইউরোপ ভ্রমন করতে যান। সেখানে তিনি তাদের কৃষ্টি কালচার প্রত্যক্ষ্য করেন। সফর থেকে ফিরে এসে তাদের পর্দাহীনতা ও নোংরামীর উল্লেখ করে সকলকে সর্তক করেন যেন কেউ তাদের এমন নোংরামীর অনুকরণ না করে। যে বর্ণনা নিয়ে এত অভিযোগ সেখানেই স্পষ্ট

উল্লেখ আছে তিনি যাদেরকে দেখেছেন তাদের গায়ে গাউন ছিল। গাউন সেই জিনিষকে বলা হয় যা দেখতে অনেকটা আলখেল্লার মত। অতএব যে নোংরামির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ধোপে টেকে না।

আপত্তি : আমি মক্কা বা মদীনায় মৃত্যুবরণ করব। *(তাযকেরাহ ৫০৩, ৪র্থ এডিসন)*

উত্তরঃ এর উত্তর দেয়ার আগে চলুন সুধী পাঠক, ১৪ জানুয়ারী ১৯০৬-এ কৃত এই ভবিষ্যদ্বাণীটির মূল পাঠ আমরা একবার দেখে নিই।[৮]

"ক) কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলি খ) সালামুন কাওলাম মির রাব্বির রাহীম গ) আমি মক্কায় মৃত্যু বরণ করব বা মদিনায়। অনুবাদঃ আল্লাহ্ শুরু থেকে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তিনি আর তার রসুলগণই বিজয়ী হবেন। রহীম খোদা বলছেন, তোমার প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থাৎ তুমি বিফল মনরথ হয়ে মারা যাবে না। আর আমি মক্কায় বা মদিনায় মারা যাব এই বাক্যের অর্থ হল, মৃত্যুর পূর্বে হয় আমি মক্কী বিজয় লাভ করব যেমন মক্কায় শত্রুদেরকে শাস্তিমূলকভাবে পরাজিত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় অর্থ হল, মৃত্যুর পূর্বে মাদানী বিজয় লাভ হবে অর্থাৎ মানুষের হৃদয় নিজে থেকেই এদিকে ধাবিত হবে।'কাতাবাল্লাহু লা আগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুসুলি' মক্কী বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। আর 'সালামুন কাওলাম্ মির রাব্বির্ রাহীম' মাদানী বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে।"*(বদর পত্রিকা ২য় খণ্ড নম্বর ৩, ১৯ জানুয়ারী ১৯০৬ পৃষ্ঠা-২; আল-হাকাম ১০ম খণ্ড, নম্বর ২, ১৭ জানুয়ারী ১৯০৬ পৃষ্ঠা-৩)*

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কোথায় মক্কা বিজয় বা মদিনা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে? যার প্রতি ইলহাম হয়েছে তিনি নিজে এর যে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটিই ধর্তব্য।[৯] ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ইলহামের যে অর্থ বোঝানো হয় সেই অর্থটিই সেই ইলহামের মৌলিক অর্থ হয়ে থাকে। তিনি যেহেতু এ ব্যাখ্যাটি কোন অভিধানের বরাতে করেন নি তাই এ বিষয়ে মজিদ সাহেবের অভিযোগ ডাহা মিথ্যা। কেননা হযরত মির্যা সাহেব মৃত্যুর আড়াই বছর আগে নিজেই এর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন।

মির্যা সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর অনেক ঘোর শত্রু তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের নাম উল্লেখপূর্বক হযরত মির্যা সাহেব বইও রচনা করেছেন। এটি ছিল মক্কী বিজয়ের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর মৃত্যুতে অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ও সমাজপতিরা তাঁর নামে শোক-বার্তা পাঠিয়েছেন। ইসলামের সপক্ষে তাঁর সুদৃঢ় অবস্থানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, যা ছাপানো আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। (কয়েকটি উদ্ধৃতি ৪৬-৪৭ পৃষ্ঠায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) মির্যা সাহেবের জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করেছে। এসবই ছিল এই 'মাদানী বিজয়ের' স্পষ্ট লক্ষণ, ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার স্পষ্ট নিদর্শন। 'আল্লামা' আপত্তির ছলে লিখেছেন, মির্যা সাহেব লাহোরে মারা যাবার পর আহমদীরা এসব মক্কা বিজয় আর মদিনা বিজয়ের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছে। 'আল্লামা'র এই আপত্তি একে বারেই ভিত্তিহীন ও অবান্তর।

আপত্তিঃ মুহাম্মদী বেগম এবং মির্যা আহমদ বেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ তার পুস্তকের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ নম্বর পৃষ্ঠায় আরো দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে **আপত্তি** করেছেন। এই দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইলহাম হল, بکر و ثیب **বিকরুন ওয়া সাইয়্যেবুন**। মির্যা সাহেব এর উল্লেখ করে নিজে বলেছেন, তার সাথে একজন কুমারী নারীর বিয়ে হবে এবং পরে আরেকজন বিধবা নারীর সাথে বিয়ে হবে। আর অপর ইলহামটি হল, মুহাম্মদী বেগমের সাথে বিয়ে সংক্রান্ত। তার মূল আপত্তি হল, মির্যা সাহেব নিজে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, তার সাথে এক বিধবা নারীর তথা মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবায়িত হয় নি।

উত্তর: মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) এক যুগ পর্যন্ত এমনটিই বুঝেছিলেন একথা সত্য। মির্যা সাহেব প্রাথমিক পর্যায়ে بکر و ثیب **'বিকরুন ওয়া সাইয়্যেবুন'** ইলহাম অনুযায়ী মনে করতেন, তাঁর সংসারে একজন কুমারী তাঁর স্ত্রী হয়ে এসেছেন অর্থাৎ হযরত নুসরত জাহান বেগম(রা.) এবং আরেক জন বিধবা তাঁর স্ত্রী হয়ে আসবেন অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত পূরণ হলে মুহাম্মদী বেগম স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘরে আসবেন। উভয় ভবিষ্যদ্বাণী কাছাকাছি সময়ে প্রাপ্ত হওয়ায় মির্যা সাহেব উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সকলকে অবগত করেছেন। بکر و ثیب

'বিকরুন ওয়া সাইয়েবুন'-এর অর্থ নিরূপন করার জন্য মুহাম্মদী বেগমের ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যাসত্য জানা আবশ্যক। এই দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী যাচাই করতে গিয়ে সর্বপ্রথম মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) রচিত গ্রন্থে মুহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা তুলে ধরছি।

মুহাম্মদী বেগমের বিষয়ে আপত্তি তোলা হয়, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) নাকি হীন কামচরিতার্থে তাঁর এক নিকট আত্মীয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর নাম ভাঙিয়ে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই মেয়ের সাথে নাকি তার বিয়ে হবেই হবে– যা পূর্ণ হয় নি।

পাঠকের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, বিষয়টি মোটেও এরকম নয় বরং অনেক বড় একটি ধর্মীয় দর্শন উন্মোচিত করার জন্য এবং জীবন্ত খোদার পরিচয় দেয়ার নিমিত্তে মুহাম্মদী বেগম ও তার পিতা আহমদ বেগের পরিবারের বিষয়ে নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ:

হযরত মির্যা সাহেবের নিকটাত্মীয় মির্যা আহমদ বেগ সামাজিক কদাচারে লিপ্ত ছিল, সে ধর্ম বিদ্বেষী ছিল। কেবল ধর্ম বিদ্বেষীই নয় বরং তারা ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শকে হাসিবিদ্রূপ ও কটাক্ষ করত। ঐশী শিক্ষার বিষয়ে সমালোচনা করত, পবিত্র কুরআনের অবমাননা করত এবং নাস্তিক্যবাদের অনুসারী ছিল। ১৮৯৩ সালে লেখা 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) তাদের এই দুরাবস্থা প্রকাশ্যে তুলে ধরে তাদের সব অপকর্মের একটি চিত্র পৃষ্ঠা ৫৬৬ ও ৫৬৭-তে বর্ণনা করেন। তারা হযরত মির্যা সাহেবের কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ চেয়ে এবং মির্যা সাহেবের সত্যতার প্রমাণ চেয়ে রসূলে করিম(সা.)-কে অকথ্য ভাষায় গালি সম্বলিত একটি চিঠি দিয়েছিল। যদিও তাদের এসব অনাচার অনেক বছর আগ থেকেই চলছিল কিন্তু বিষয়টিকে সবিস্তারে অনেক বছর পর হযরত মির্যা সাহেব ১৮৯৩ সনে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

এ প্রেক্ষিতে হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্র কাছে মিনতি করে দোয়া করেছিলেন, **ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি উনসুর আব্দাকা ওয়াখ্যুল আ'দাআকা**। অথার্ৎ, হে আমার প্রভু, হে মালিক আমার! তোমার এই অধম বান্দাকে সাহায্য কর এবং তোমার শত্রুদের অপদস্ত কর। এ প্রেক্ষিতে হযরত মির্যা সাহেবকে ইলহাম করে আল্লাহ তাদের প্রতি নিজ ক্রোধের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার অনুবাদ তুলে ধরছি,

"নিশ্চয় আমি তাদের অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রত্যক্ষ করেছি। অচিরেই আমি তাদেরকে নানাবিধ বিপদে জর্জরিত করব। তুমি দেখবে আমি তাদের সাথে কী আচরণ করি এবং আমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। নিশ্চয় আমি তাদের নারীদেরকে বিধবা এবং তাদের পুত্রসন্তানদের এতিম এবং তাদের বাড়িঘরকে ধ্বংসাবশেষে পরিণত করতে যাচ্ছি। যেন তারা তাদের ঔদ্ধত্যের এবং কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করে। কিন্তু আমি তাদেরকে এক নিমিষে ধ্বংস করব না বরং পর্যায়ক্রমে শাস্তি দিব যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে এবং তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নিশ্চয় আমার অভিশাপ তাদের ওপর, তাদের গৃহের প্রাচীরের ওপর, তাদের ছোট ও বড়দের প্রতি, তাদের নারী ও পুরুষদের প্রতি আপতিত হতে যাচ্ছে, এমনকি তাদের অতিথিদের প্রতিও যারা তাদের গৃহে প্রবেশ করবে- আর এরা সবাই অভিশপ্ত"*(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম: পৃষ্ঠা ৫৬৯)।*

এই হচ্ছে মির্যা আহমদ বেগ সংক্রান্ত সেই মূল ভবিষ্যদ্বাণী যেটা প্রকাশ না করে আহমদী বিরোধী আলেম-উলামা ভবিষ্যদ্বাণীর একটি খণ্ডিত চিত্র উপস্থাপন করে থাকেন। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে, আমি তাদেরকে এক নিমিষে ধ্বংস করব না বরং পর্যায়ক্রমে শাস্তি দিব যেন তারা সৎপথে ফিরে আসে এবং তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উদ্দেশ্য শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করা নয় বরং উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ এবং তাদেরকে প্রত্যাবর্তণ করার বা তওবা করার সুযোগ দেয়া। এদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালান। 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থে হযরত মির্যা সাহেব এ বিষয়ে লিখেছেন, আল্লাহর কাছে তিনি কেবল তাদের শাস্তির জন্যই দোয়া করেন নি বরং তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় মির্যা আহমদ বেগের মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন যেন আল্লাহ্‌র জীবন্ত নিদর্শনের ছোঁয়া লাভ করে তাদের পরিবারের সদস্যগণ ও সমমনারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। মহানবী(সা.)-এর জীবনে আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাই। ইসলামের ঘোর শত্রু আবু সুফিয়ানের মেয়েকে রসূল(সা.) বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। এর ফলে তাঁর বংশ ও পরিবার নবুয়্যতের আধ্যাত্মিক কিরণ থেকে জ্যোতি লাভ করতে পেরেছে। একই কথা হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই বিন আখতাব(রা.)-এর জন্যও প্রযোজ্য।

'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থেও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশেরও আগে ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, 'তারা যদি তওবা না করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের পরিবারের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করবেন যার ফলে তারা অবশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের বাড়িতে বিধবাদের আধিক্য হবে, তাদের দেয়াল ও প্রাচীরেও ঐশী ক্রোধ বর্ষিত হবে। কিন্তু তারা যদি অনুশোচনা করে তাহলে আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন' (বিজ্ঞাপন ১৮৮৬, ২০শে ফেব্রুয়ারী)।

হযরত মির্যা সাহেব ১৮৮৮ সালের ১৫ই জুলাই আরেকটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন। এতে তিনি একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেন যাতে তিনি মুহাম্মদী বেগমের নানীকে সম্বোধন করে সাবধান করেছিলেন। হযরত মির্যা সাহেব বলেন, 'স্বপ্নে এই মহিলাকে দেখলাম, তার চোখে-মুখে কান্নার ছাপ ছিল। আমি তাকে স্বপ্নে বলেছিলাম, তুমি তওবা কর, তুমি তওবা কর! তোমার পরিবার পরিজনের প্রতি শাস্তি নেমে আসতে যাচ্ছে। **একজন মারা যাবে** এবং তার পক্ষ থেকে অবশিষ্ট রয়ে যাবে কয়েকটি কুকুর' (বিজ্ঞাপন ১৫ জুলাই ১৮৮৮ এবং তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০)।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবধানবাণীর প্রেক্ষিতে মুহাম্মদী বেগমের সাথে যে বিয়ের প্রস্তাবটি করা হয়েছিল তাতে হযরত মির্যা সাহেব লিখেছিলেন, মির্যা আহমদ বেগ তার মেয়েকে যদি আমার সাথে বিয়ে না দেয় আর ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে ক্ষান্ত না হয়, সেক্ষেত্রে অন্যস্থানে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার তিন বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই মুহাম্মদী বেগের পিতা আহমদ বেগ মৃত্যুবরণ করবে। আর যার সাথে বিয়ে হয়েছে যদি সে তওবা না করে তাহলে সেও বিয়ের আড়াই বছর পর মারা যাবে আর মুহাম্মদী বেগম বিধবা হবার পর আমার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে।

পাঠক! ভাল করে লক্ষ্য করুন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তওবার কথা, আল্লাহর কাছে অনুশোচনা করা এবং ধর্মবিদ্বেষ দূর করার কথা বলা হচ্ছে আর এটি স্পষ্টভাবে একটি শর্তযুক্ত সাবধানবাণী।

এটি একটি শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীও বটে। তওবা করলে আল্লাহ্ দয়া করবেন আর তওবা না করলে ঐশী শাস্তি ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হবে। ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞাপন, ১৮৮৮ সালের বিজ্ঞাপন এবং ১৮৯৩ সালে 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলামের'ভবিষ্যদ্বাণীটি আরেকবার লক্ষ্য করুন। ১৮৮৮ সালের ভবিষ্যদ্বাণীতে

স্পষ্ট বলা হয়েছে, **একজন মারা যাবে**। যখন মির্যা আহমদ বেগ ধৃষ্টতা দেখিয়ে মির্যা সুলতান মুহাম্মদের সাথে মেয়ে মুহাম্মদী বেগমের বিয়ে দেয় তখন তার ঔদ্ধ্যত্বের কারণে তার বিরুদ্ধে ঐশী সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়ে যায়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মির্যা আহমদ বেগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মারা গেল। এত স্পষ্ট ও জোরালোভাবে হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়েছিল যার কারণে মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর মত মির্যা সাহেবের ঘোর বিরোধীও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সে তার নিজ পত্রিকায় লিখেছে:**'যদিও এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে– তবে এলহামের কারণে নয় বরং জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে'** [ইশায়াতুস সুন্নাহ, ৫ম খণ্ড, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সানের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য] এই ঘটনার পর মির্যা আহমদ বেগের গোটা পরিবার সম্বিত ফিরে পায় এবং তারা তওবা করে। তাই পরম দয়ালু খোদা তাদের তওবা গ্রহণ করে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং শাস্তির অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী স্থগিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ আলেম মাত্রই জানেন, ভবিষ্যদ্বাণী দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি হল, সুসংবাদবাহী ভবিষ্যদ্বাণী তথা 'ওয়াদা' এবং অপরটি শাস্তির বার্তা সম্বলিত সতর্কবাণী যাকে 'ওয়াঈদ'ও বলা হয়। ক্রোধ প্রকাশক ভবিষ্যদ্বাণী বা 'ওয়াঈদ' শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। হযরত ইউনুস(আ.)-এর জাতি তাদের ধ্বংসের নির্ধারিত দিনের একদিন আগে তওবা করে রক্ষা পেয়েছিল। তেমনিভাবে ফেরাউনের জাতি উপর্যুপরি অন্যায়ের কারণে ক্রোধভাজন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে বারবার ছাড় দেয়া হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর যুগের কাফেররা বারবার ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّـهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাদেরকে ততদিন পর্যন্ত শাস্তি দিতে যাচ্ছেন না যতদিন তুমি (হে মুহাম্মদ) তাদের মাঝে বসবাস করছ। আর আল্লাহ্ তাদেরকে ততক্ষণ শাস্তি দিতে যাচ্ছেন না যতক্ষণ তারা ইস্তেগফারে রত থাকবে' (সূরা আনফাল: ৩৪)।

সতর্কবার্তা সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে এই হচ্ছে ঐশী বিধান। শর্ত পূর্ণ হলে শাস্তি আপতিত হয় আর শর্ত পূর্ণ না হলে শাস্তি স্থগিত হয়ে যায়। এটিই আল্লাহ তা'লার সুন্নত।

পাঠকবৃন্দ, 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ ও তার সমমনারা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে যতই কটাক্ষ করুন না কেন মুহাম্মদী বেগম এবং তার পরিবার তা করেন নি। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, হযরত মির্যা সাহেব সত্য। মুহাম্মদী বেগমের স্বামী সুলতান মুহাম্মদ এ কথা স্বীকার করে বলেছেন, 'আমি মির্যা সাহেবকে আগেও বুযুর্গ মনে করতাম এখনও করি। কিন্তু আক্ষেপ আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি নি।' (২০/০৬/১৯১৩ তারিখে লেখা পত্র যা তিনি 'আম্বালা ক্যান্ট' থেকে স্বহস্তে লিখেছিলেন)[১০]

মির্যা আহমদ বেগ ও তার পরিবার সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যে শর্তানুযায়ী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তার আরেকটি অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরছি। যে পরিবার সম্বন্ধে এই শাস্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তাদেরই অনেকে মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করেছেন। অথচ কোন লম্পট ব্যক্তি যদি কুপ্রবৃত্তির অধীন হয়ে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করে তবে সংশ্লিষ্ট পরিবার মরে গেলেও উক্ত লম্পটকে কখনও গ্রহণ করবে না। কিন্তু আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। একদিকে মির্যা আহমদ বেগ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মারা গেল আর অমনি তার পরিবারের লোকজন অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে ফেলে। তাদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি হয় আর তারা খোদার জ্বলন্ত নিদর্শন দেখতে পায়। এমনকি অনুতপ্ত হয়ে তারা মির্যা সাহেবের কাছে ক্ষমা ও দোয়া চেয়ে চিঠিও লেখে। শুধু তাই নয়, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার কিছুকাল পর সেই পরিবারের অনেক সদস্য মির্যা সাহেবের বয়াত করে তাঁর জামা'তভুক্ত হন। বয়াতকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- (১) মির্যা আহমদ বেগের বিধবা স্ত্রী স্বয়ং অর্থাৎ মুহাম্মদী বেগমের মা, (২) আহমদ বেগের এক পুত্র মির্যা মোহাম্মদ বেগ, (৩) আহমদ বেগের এক মেয়ে ইনায়াত বেগম, (৪) তাঁরই আরেক মেয়ে সরদার বেগম, (৫) আহমদ বেগের ছেলের ঘরের নাতি মির্যা মাহমুদ বেগ ও (৬) আহমদ বেগের আরেক মেয়ে মাহমুদা বেগম। এছাড়া আহমদ বেগের দুই জামাতাও বয়েত করেন। যদিও উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কেবল তওবা করার শর্ত ছিল, বয়াত করতে হবে বলে আদৌ কোন শর্ত ছিল না, তথাপী তারা স্বতস্ফূর্তভাবে বয়াত করেছিলেন। মুহাম্মদী বেগমের নাতি-নাতনিরা আজও আহমদীয়া জামা'তের নিষ্ঠাবান সদস্য অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সত্যায়নকারী। এদের আহমদী হবার কারণ হল,

তারা মির্যা সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখেছে। মূল ভবিষ্যদ্বাণীতে যেভাবে একজন দাম্ভিকের মৃত্যু সংবাদ দেয়া ছিল ঠিক সেভাবেই পূর্ণ হয়েছে। যে পরিবার সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী, যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলাফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে এবং বাহ্যত ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে তারাই যখন নিজেদের আমলের মাধ্যমে অর্থাৎ মির্যা সাহেবের বয়াত করার মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য বলে ঘোষণা দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের এত হৈচৈ, এত আপত্তি প্রবাদ 'বাদী নীরব আর সাক্ষী সরব'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ! মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ও মির্যা আহমদ বেগের পরিবারভুক্ত লোকদের মির্যা সাহেবের বয়াত করার পরও আপনার মত বিচক্ষণ আলেমে দ্বীনের কোন সাফাই বক্তব্য থাকতে পারে কি?

মুহাম্মদী বেগম ও মির্যা আহমদ বেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণের পর এখন আমরা আবার ফিরে আসি **'বিকরুন ওয়া সাইয়েবুন'** ইলহাম প্রসঙ্গে।

পাঠকবৃন্দ নিঃসন্দেহে এতক্ষণে বুঝে গেছেন, ভবিষ্যদ্বাণী আলেমুল গায়েব আল্লাহ্‌ স্পষ্ট না করা পর্যন্ত কোন বান্দা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, কেবল নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারে। মুহাম্মদী বেগমের সাথে মির্যা সাহেবের বিবাহ বন্ধনের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে মির্যা সাহেব ইজতেহাদ করেছিলেন হয়তো মুহাম্মদী বেগমই বিধবা হয়ে মির্যা সাহেবের পরিবারভুক্ত হবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ প্রদত্ত শর্ত পূর্ণ না হওয়ায় মুহাম্মদী বেগমের সাথে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর বিয়ে হয় নি। ফলে, মির্যা সাহেব প্রাপ্ত ইলহাম থেকে যে ইজতেহাদ করেছিলেন তা বাস্তবে ফলে নি। এতে অবাক হবার কিছু নেই। নবীদের দ্বারাও ইজতেহাদে ফলাফল নির্ণয়ে ব্যত্যয় হতেই পারে।

মহানবীহযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর জীবদ্দশায় এরকম একাধিক ঘটনা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বপ্নযোগে তাওয়াফ করার দৃশ্য দেখে মহানবী(সা.) হজ্জ করতে গিয়ে বুঝতে পারেন, সেই বছর হজ্জের ইঙ্গিত ছিল না। আবার, হযরত মুহাম্মদ(সা.) নিজে বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি খেজুর বাগানের দিকে হিজরত করছি, আমি মনে করেছিলাম, সম্ভবত আমরা ইয়ামামার দিকে হিজরত করব। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম ইয়ামামার দিকে ইঙ্গিত ছিল না বরং ইঙ্গিত মদিনার দিকে ছিল। হুযুর(সা.)-এর এই স্বপ্ন দেখে ব্যাখ্যা করা ও

পরবর্তীতে স্বপ্ন ভিন্নরূপে বাস্তবায়িত হওয়া সাব্যস্ত করছে,আল্লাহর পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ওহী, স্বপ্ন, কাশ্‌ফ ইত্যাদির প্রকৃত তত্ত্ব ও রহস্য বাস্তবায়িত হবার পরই পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়। এর আগ পর্যন্ত অনেক সময় বিষয়টি নবী রসূলদের কাছেও অস্বচ্ছ থাকতে পারে। একই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ(সা.)-এর পূর্বেকার নবী হযরত নূহ(আ.)-এর একটি ঘটনা তুলে ধরতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর সাথে অঙ্গিকার করেছিলেন, প্লাবন আসছে তুমি নৌকায় চড়। আমি তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করব। পরবর্তীতে নূহ(আ.) তাঁর এক ছেলেকে আহ্বান জানানো সত্ত্বেও নৌকায় আরোহনে সে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে প্লাবন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন হযরত নূহ(আ.) দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত আর তোমার অঙ্গিকার যে সত্য তা-ও আমি জানি *(সূরা হূদ: ৪৬)*। আমার ছেলের তাহলে এ কী হল? আল্লাহ্ উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। যদিও সে তোমার ঔরসজাত পুত্র কিন্তু সে তোমার সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় যাকে রক্ষা করার আমি অঙ্গিকার করেছি। কেননা সে অসৎকর্মে লিপ্ত থাকত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'পরিবার' বলতে সৎকর্মশীল আধ্যাত্মিক অনুসারীদের বুঝানো হয়েছিল। বুঝা গেল, হযরত নূহ(আ.) ভবিষ্যদ্বাণীটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছিলেন অথচ প্রকৃত মর্ম ছিল এর চেয়ে ভিন্ন। আবার, নেনোভার অধিবাসীদের বিষয়ে হযরত ইউনুস(আ.)-আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জেনে শাস্তির যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা-ও একটি সতর্কবাণী ছিল যার সময়সীমা ছিল চল্লিশ দিন। কিন্তু এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পরও নেনেভার অধিবাসীরা তওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিল। বোঝা গেল, সতর্কবাণী তথা 'ওয়াঈদ' অনুশোচনা ও সংশোধন না করলে কার্যকর হয়। অথচ হযরত ইউনুস(আ.) মনে করেছিলেন, তার জাতি ৪০ দিনের মাথায় ধ্বংস হতে বাধ্য! এসমস্ত বিষয় পবিত্র কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত এবং প্রত্যেক বিদগ্ধ আলেম এ বিষয়গুলো জানেন। ঠিক একইভাবে মির্যা সাহেবও তাঁর আলোচ্য ইলহামের যে ব্যাখ্যাই বুঝেছিলেন– তাতে আপত্তি করা কারও সাজে না। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী স্পষ্ট করে দিয়েছে, **ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত কুমারী ও বিধবা উভয় অংশই তাঁর সহধর্মীনি হযরত নুসরত জাহান বেগম(রা.)-এর মাধ্যমেই পূর্ণ হবার ছিল এবং সেভাবেই হয়েছে।** অর্থাৎ তিনি কুমারী অবস্থায় তাঁর স্ত্রী হয়ে আসবেন এবং

স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা অবস্থায় রয়ে যাবেন। অতএব পবিত্র কুরআন অনুযায়ী হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এ সত্ত্বেও কেউ যদি হঠকারিতা দেখিয়ে মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে চায় এর দায়দায়িত্ব আপত্তিকারীর ওপরই বর্তায়।

আপত্তি : মির্যা সাহেব বলেন, আমি (আল্লাহ্) চোরের মত গোপনে আসব। (রুহানী খাযায়েন ২০/৩৯৬)”- ‘আল্লামা’ আপত্তি করে বলেছেন, মহান আল্লাহকে চোরের সাথে তুলনা করে কাদিয়ানী সাহেব কোন্ মর্যাদা রক্ষা করতে গেলেন? গোপনে আসা কি চোর ছাড়া অন্য কোন উপমা দিয়ে বোঝানো যেত না?

উত্তর: আপত্তিটির প্রথম উত্তর হল, একথাটি মির্যা সাহেবেরই নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত একটি ইলহাম। অতএব ‘আল্লামা’-র উচিৎ আপত্তিটি আল্লাহর কাছে উত্থাপন করা। কিন্তু তিনি যদি এটিকে সত্য ইলহাম হিসেবে মনে না করেন, তাহলে মুসলমান হিসেবে তাকে এ কথা বিশ্বাস করতেই হবে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপকারী ভণ্ডদের শাস্তি দিতে এবং ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। এটি যদি মির্যা সাহেবের মনগড়া কোন কথা হত, আর আল্লাহ্ যদি এটিকে নিজের জন্য অপমানজনক কোন বিষয় বলে মনে করতেন তাহলে তিনিই মির্যা সাহেবকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’লা বলেন,

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۝ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۝

অর্থাৎ ‘আর সে যদি কোন কথাকে মিথ্যা বানিয়ে আমাদের প্রতি আরোপ করত তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধরতাম এবং আমরা অবশ্যই তার জীবন শীরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারত না। (সূরা আল হাক্কা: ৪৫-৪৮)আমরা যারা মুসলমান, আমরা জানি ও ঈমান রাখি, হযরত মুহাম্মদ(সা.) সত্যবাদী নবী ও রসূল ছিলেন। আমরা জানি তিনি(সা.) ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবী করেন আর ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মহানবী(সা.) তাঁর প্রথম ওহী লাভ করার পর ২৩ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। মুসলমান আলেমগণ এই মানদণ্ডটিকে আহলে কিতাবদের সামনে মহানবী(সা.)-এর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থান করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। আল্লাহ্ তা’লা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের কেউ মিথ্যা দাবীদারকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা’তের নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ শারাহ্ আকায়েদ নাসফীতে লেখা আছে, নবী ছাড়া অন্য কারো মাঝে এসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহ্ তা’লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করার পরও আল্লাহ্

তাকে ২৩ বছর ছাড় দিবেন– এটিও একেবারে অসম্ভব' (মাবহাসুন নাবুওয়াত পৃষ্ঠা, ১০০)।

এরপর তিনি মানদণ্ড হিসেবে ২৩ বছর কেন নিলেন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উক্ত শারাহ্ আকায়েদ নাসফীতে লিখেন, নিশ্চয় মহানবী(সা.) যখন আবির্ভূত হয়েছেন তখন তার বয়স ছিল ৪০ বছর আর যখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন তখন তার বয়স ছিল ৬৩ বছর। (মাবহাসুন নাবুওয়াত পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠা ৪৪৪)তাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারিত এই মানদণ্ডে চলুন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-কে যাচাই করে দেখি। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) ১৮৮০ সালের আগ থেকেই আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শরীয়ত বিহীন ওহী ও ইলহাম প্রাপ্তির দাবী করেন। আর এ দাবী তিনি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে প্রকাশ করে দেন। আর সফল জীবন কাটিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন ১৯০৮ সনে। অর্থাৎ মির্যা সাহেব ইলহাম প্রাপ্তির দাবী করার পর ২৮ বছরেরও বেশী জীবন লাভ করেছেন। অতএব পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) তাঁর দাবীতে সত্য প্রমাণিত হন। অনেকে খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে বলে ফেলেন, এমন তো অনেকেই করতে পারে এবং ২৩ বছর জীবন লাভ করতে পারে। যারা এমন কথা বলেন তাদেরকে বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন। আমাদের আল্লাহ্ এখনও তেমনই ক্ষমতার অধিকারী যেমনটি তিনি মুহাম্মদ(সা.)-এর সময় ছিলেন। এমন বক্তব্য খোদার বিরুদ্ধে চরম ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জ শুনুন! পৃথিবীতে এমন কোন মিথ্যা দাবীদার দেখাতে পারবেন না যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা ওহী ও ইলহাম আরোপ করে আল্লাহ্ নির্ধারিত ২৩ বছর জীবন লাভ করেছে। নবুয়্যতের মিথ্যা দাবীদার অনেকেই গত হয়েছেন, যেকোন একটি উদাহরণ দেখান যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী ও ইলহাম লাভের মিথ্যা দাবী করেও ২৩ বছর জীবন পেয়েছে। অসম্ভব, কখনও এমনটি হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মিথ্যারোপকারীকে আল্লাহ্ নিজে ধ্বংস করে দেন। অতএব হৃদয়ের চোখ উন্মুক্ত করে দেখুন এই আয়াত কীভাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর সপক্ষে সত্যতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আল্লাহ্ মির্যা সাহেবকে ধ্বংস না করে পদে পদেউল্টো তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে সাহায্য ও বিজয় দান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন মির্যা সাহেব মিথ্যাচার করেন নি, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকেই ইলহাম করা হয়েছে।

এ কথা সর্বজন বিদিত, উপমা দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বদাই কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে উপমা দেয়া হয়। যেমন, কাউকে যদি 'বাঘের বাচ্চা' বলে উপমা দেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা কেবল বাঘের বীরত্বের গুণের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়, অন্যান্য নেতিবাচক বিষয় যেমন, এর হিংস্রতা বা এর পশুত্ব এতে ধর্তব্য হয় না। কেউ যদি বাঘের বাজে দিকগুলোকে মাথায় এনে চিন্তা করে তাহলে এটিও গালির পর্যায়ে পড়তে পারে। একইভাবে অন্যান্য উপমা ও তুলনার বিষয় যাচাই করা কর্তব্য। কাউকে 'গামা' বা 'রুস্তম' পাহল্ওয়ান বললে সে আনন্দিত হয় ঠিকই কিন্তু সে যদি বংশ পরিচয় বা বাপের পরিচয় পাল্টে দেয়ার কথাটি ভাবে তাহলে উপমা প্রদানের মূল উদ্দেশ্যই ভেস্তে যাবে।

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ২৪৬ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً .....

অর্থ, 'কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিবে যেন তিনি তার জন্য এটিকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন?' এ আয়াতে কি আল্লাহ্ তা'লা নিজেকে অভাবী সাব্যস্ত করছেন? না, বরং ঋণগ্রহিতা হিসেবে এখানে আল্লাহর একটি বিশেষ দিক তুলে ধরা হচ্ছে। ঋণ যেমন মানুষ ফিরে পায়, তেমনই তোমরাও অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যায়কারীরাও আল্লাহ্র পথে ব্যায়কৃত সম্পদ অবশ্যই ফেরৎ পাবে। কেবল একথা বোঝানোর জন্য ঋণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ঠিক একইভাবে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হাশরের মাঠে আল্লাহ তাঁর কোন এক বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, "আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম- তোমরা আমাকে খাবার দাও নি, আমি পিপাসার্ত ছিলাম- তোমরা আমাকে পানি পান করাওনি, আমি নগ্ন ছিলাম- তোমরা আমাকে বস্ত্র দাও নি, আমি অসুস্থ ছিলাম- তোমরা আমাকে সেবা কর নি।" *(মুসলিম, অধ্যায়: আল-বিররু ওয়াস-সিলাহ ওয়াল আদাব, অনুচ্ছেদ: ফাযলি ইয়াদাতিল-মারীয)*

'আল্লামা', এখন বলুন উপরোক্ত হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে কি এগুলোর চেয়ে ভাল কোন উপমা খুঁজে পান নি? ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত হবার কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু তৃতীয় উপমাটি বাহ্যিক অর্থে আল্লাহ্র ঘোরতর

অবমাননা নয় কি? অথচ সবার জানা কথা, আল্লাহ্ তা'লা উপরোক্ত সমস্ত দোষ-দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ঠিক একইভাবে চোরের মত সংগোপনে আসার উদাহরণ আল্লাহ্ এজন্যই দিয়েছেন, চোর একেবারে নীরবে নির্জনে আর নিভৃতে আসে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সংগোপনে আসে। সবার অলক্ষ্যে আসার নাম হল চোরের মত আসা। উপরোক্ত উদাহরণ দিয়ে এটিই বুঝানো হয়েছে, এর চেয়ে বাড়তি কিছু নয়। সংগোপনে অকস্মাৎ ঐশী নিদর্শনাবলীর প্রকাশিত হবার বিষয়টিকে এভাবে বলা হয়েছে মাত্র।

আপত্তিঃ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব রূহানী খাযায়েন ১৮শ খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আল্লাহ্ আমার হাতে বয়াত গ্রহণ করেছেন'

উত্তর: 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ মির্যা সাহেবের 'সব বই পড়ে এবং গবেষনা করে' যে আপত্তিটি উত্থাপন করেছেন, এমন কোন দাবীই মির্যা সাহেব করেন নি!

প্রিয় পাঠক, রূহানী খাযায়েন ১৮শ খণ্ডের ২২৭ নম্বর পৃষ্ঠায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) তাঁর কয়েকটি আরবী ইলহাম প্রকাশ করেছেন। খোদার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এসব ইলহামের মাঝে একটি বাক্য হল, **'ইন্নি বায়া'তুকা বায়া'নী রাব্বী'**। এ থেকে 'আল্লামা' যে বিকৃত অর্থ বের করেছেন তা মোটেও ধোপে টেকে না। কেননা ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ং এর সাথেই এর অনুবাদ প্রকাশ করে দিয়েছেন। ২২৭ নম্বর পৃষ্ঠা থেকেই এসব ইলহামের অনুবাদ আরম্ভ হয়ে পরবর্তী পৃষ্ঠা অর্থাৎ ২২৮ নম্বর পৃষ্ঠায় গিয়ে শেষ হয়েছে।[১১] যে কোন নিরপেক্ষ খোদাভীরু ব্যক্তি উক্ত ইলহামের অর্থ বোঝার জন্য বা দাবীকারকের দাবী জানার জন্য 'মুলহাম্' তথা সেই ইলহামপ্রাপ্ত ব্যাক্তিরই দ্বারস্থ হতে বাধ্য। কিন্তু বিদ্বেষ ও শত্রুতা মানুষকে কখনও কখনও এতঅন্ধ করে দেয় যার কারণে, সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। আরবী শব্দ 'বায়উন' অর্থ 'ব্যবসা' তথা 'লেনদেন'। এ ইলহামে সে শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) নিজে এ ইলহামের অর্থ প্রকাশ করে লিখেছেন: "আমি তোমার সাথে একটি লেনদেন করেছি। অর্থাৎ, একটি জিনিষ আমার ছিল

যার অধিকারী তোমাকে করা হয়েছে আর তোমার কাছে একটি জিনিষ ছিল যার অধিকারী হয়েছি আমি। তুমিও এই ব্যবসার স্বীকারোক্তি দিয়ে বল, 'খোদা আমার সাথে একটি লেনদেন করেছেন।' যারা আধ্যাত্মিক জগতের সামান্য ছোঁয়াও রাখেন তারা ভালভাবে জানেন, আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সঁপে দেয়াই হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'লা নিজের সন্তুষ্টি তথা 'জান্নাত' দান করেন। একথার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

إِنَّ اللَّـهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসী মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন– এর বিনিময়ে তাদেরকে জান্নাত দেয়ার শর্তে' (সূরা তওবা, আয়াত **১১১**)। এ আয়াতের শেষে বিশ্বাসী মুমিনদের একাজটিকে স্পষ্ট ভাষায় একটি 'ব্যবসা' বা লেনদেন হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'লা বলছেন, 'فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ' অর্থ: 'অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসার কারণে আনন্দিত হও যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটিই হল মহাসাফল্য।' 'আল্লামা' আব্দুল মজিদকে জিজ্ঞেস করি, যে ব্যক্তি নিজ জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পূর্বঘোষিত মহাসাফল্য লাভের সুসংবাদ পেয়েছেন তাঁর বিরোধিতা করা কি আপনার মত একজন আলেমের সাজে? নাকি **'তাজ্‌আলূনা রিযকাকুম আন্নাকুম তুকায্‌যিবূন'** কথাটি আপনার জন্যও প্রযোজ্য? একদিকে এত গভীর আধ্যিাত্মিক বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার চালাকি, অপরদিকে ইলহামের অর্থ বিকৃত করার ধৃষ্টতা! আল্লাহ্‌র ভয় বলতে কি কিছুই অবশিষ্ট নেই?

আপত্তিঃ একবার আমার প্রতি ইলহাম হল, আল্লাহ্ নিজের ওয়াদা মত কাদিয়ানে অবতীর্ণ হবেন (তাযকেরাহ পৃঃ ৩৫৮, ৪র্থ এডিসন চতুর্থ)।

উত্তরঃ কাদিয়ানে আল্লাহ্ অবতরণ করবেন– এতে আপত্তির কী আছে? যেখানে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ আগমন করেন সেখানে তো আল্লাহ্ নাযিল হবেনই হবেন। বরং এটা না হলে আপত্তি হত, এ কেমন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ্ নাযিল হন না? আল্লাহ্‌র নাযিল হবার অর্থ ঐশী নিদর্শনাবলির প্রকাশ এবং তাঁর প্রত্যাদিষ্টের পক্ষে ঐশী সমর্থন। মুসলিম শরীফের কিতাবুল ফিতানের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শেষ যুগে আগমনকারী মসীহ্‌র প্রতি

আল্লাহ ইলহাম ও ওহী করবেন। অর্থাৎ সত্য মসীহ ও মাহদী আল্লাহর নিদর্শন ও ওহীপ্রাপ্ত হবেন। একথাই আলোচ্য ইলহামে আরেকভাবে বর্ণিত হয়েছে। শুধু প্রতিশ্রুত মসীহর বেলায় কেন, সাধারণ মুসলমানদের কাছেও আল্লাহ প্রতি রাতের শেষ প্রহরে নাযিল হন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে (বুখারী শরীফ)। সাধারণ বান্দাদের কাছে প্রতিরাতে আল্লাহর অবতরণ যদি আপত্তির কারণ না হয়ে থাকে তাহলে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর বিষয়ে আপত্তি কেন?

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব লিখেছেন, "স্বপ্নে দেখলাম, আমি খোদা এবং বিশ্বাস করলাম আসলেই তাই। (রুহানী খাযায়েন ৫/৫৬৪)

উত্তরঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) রচিত 'আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম' গ্রন্থের ৫৬৪ নম্বর পৃষ্ঠার আরবী অংশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। চলুন, প্রথমে তাঁর লেখা আরবী অংশের অনুবাদটি দেখে নেয়া যাক।

আমি **স্বপ্নে** নিজেকে আল্লাহ্ হিসাবে দেখেছি এবং দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল আমিই তিনি। আর আমার নিজস্ব কোন ইচ্ছা, চিন্তা বা আচরণ অবশিষ্ট থাকল না, আর আমি একটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ একটি পাত্রের মত হয়ে গেলাম বরং এমন একটি বস্তুর মত হয়ে গেলাম যাকে আরেক সত্তা বগলদাবা করে এমনভাবে নিজের মাঝে লুকিয়ে ফেলেছে যার ফলে তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব বা গন্ধ বলে কিছুই রইল না আর সে তাঁর মাঝে বিলিন হয়ে গেল...'[১২]

'...আর আমার আল্লাহ্-রূপে নিজেকে দেখার অর্থ হচ্ছে কায়ার দিকে ছায়ার প্রত্যাবর্তন। খোদা-প্রেমিকদের সাথে এরকম ঘটনা অহরহ ঘটেই থাকে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ যখন কোন মঙ্গল সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন যেভাবে তাঁর ইচ্ছা পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞা চায়, সেভাবে তা পূর্ণ করার লক্ষে আমাকে তাঁর উদ্দেশ্য ও একত্ববাদের বিকাশস্থলে পরিণত করেন। সৎকর্মশীল, কুতুব ও সিদ্দীকদের সাথে তিনি এ ধরনেরই আচরণ করে থাকেন।'[১৩]

হযরত মির্যা সাহেব শেষে গিয়ে বলছেন, "এই ঘটনার মাধ্যমে আমি 'ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ' (সর্বেশ্বরবাদ) মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণাকে বুঝাই না

আবার এর মাধ্যমে আমি 'হুলুলিয়্যিন' (অর্থাৎ আক্ষরিকভাবে খোদা কারো মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যান এমন) মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণাকেও বুঝাচ্ছি না বরং এ ঘটনাটি ঠিক তেমনই যেমনটি মহানবী(সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ নফল ইবাদতের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বুখারী শরীফে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে-সে কথাই বুঝিয়েছি।"[১৪]

পাঠকবৃন্দ, এ পুরো বিষয়টি হযরত মির্যা সাহেবের স্বপ্নে দেখা একটি দৃশ্য। হযরত মির্যা সাহেব তার দেখা স্বপ্ন তুলে ধরেছেন এবং এর পাশাপাশি এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অর্থ ও ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। স্বপ্নের দৃশ্যকে ভিত্তি করে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) নিজেকে কোথাও আল্লাহ্ বলে ঘোষণা দেন নি বরং তিনি নিজেকে আল্লাহ্র শক্তি ও পরিকল্পনার বিকাশস্থল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি একটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ পাত্র হিসাবে উপস্থাপন করেছেন যার নিজের কোন ইচ্ছা বা বাসনা অবশিষ্ট নেই। নিজেকে আরেক অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গীণ অধীনস্থ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যেভাবে কোন বস্তুকে কেউ পূর্ণরূপে আয়ত্বে নিয়ে নেয়। আর এটি স্পষ্ট করার জন্য তিনি 'বগলদাবা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর শেষে গিয়ে নিজেকে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন এক ইবাদতকারী বান্দা হিসেবে উল্লেখ করে বুখারী শরীফের সেই বিখ্যাত হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে হাদীসে নফল ইবাদতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের উল্লেখ করে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই হাদীসটি হল,

হযরত আবু হুরায়রা(রা.) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ...আমার বান্দা নফল ইবাদত করতে করতে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এত প্রিয় বানিয়ে নেই যেন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে হাঁটে...' *(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াযু'; ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বুখারী শরীফের ১০ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৭৩ হাদীস নম্বর- ৬০৫৮ দ্রষ্টব্য)।*

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ্কে ভয় করে বলুন, এ লেখার মাঝে মির্যা সাহেব আল্লাহ্ হবার দাবী করেছেন নাকি আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন এক নগণ্য বান্দা হবার দাবি

করেছেন? আল্লাহ্ স্বপ্নযোগে তাঁর প্রিয় বান্দাকে যে দৃশ্য দেখান তার জন্য কি বান্দাকে দায়ী করা যেতে পারে? যদি স্বপ্নে দেখা দৃশ্যাবলি সম্পর্কে এদেশের আলেম-উলামার আপত্তি থেকে থাকে তাহলে আমাদের বিনীত প্রশ্ন, সূরা ইউসুফের শুরুতেই উল্লেখ আছে, হযরত ইউসুফ(আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন, এগারটি তারা এবং চন্দ্র-সূর্য তাকে সেজদা করছে (সূরা ইউসুফঃ ৫)।

সকল মুসলমান জানে সেজদা কেবল আল্লাহ্কেই করা যায়। বলুন, হযরত ইউসুফ(আ.) কি তবে খোদা হবার তথা উপাস্য হবার দাবী করেছেন? কক্ষনো না! একথা সবাই জানে, হযরত ইউসুফ(আ.)-এর স্বপ্নটির একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রয়েছে।

অতএব মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-ও তার স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা হবার দাবী করেন নি বরং খোদার মহান অস্তিত্বের পক্ষ থেকে এই স্বপ্নে সূক্ষ্ম একটি ভবিষ্যদ্বাণী জানানো হয়েছে।

মূলত এই স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছেন, হে গোলাম আহমদ! তুমি তোমার আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে আমার এত নৈকট্য লাভ করেছ যার ফলে, তুমি আমার মহান অস্তিত্বের বিকাশস্থলে পরিণত হয়ে গেছ। আমি আমার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা এ যুগে তোমার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব। আর বাস্তবে তা-ই হয়েছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্বলিত ইবনে সিরিন(রহ.)-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **তা'বীরুর রুইয়া**-এ মানবীয় রূপে আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করার অর্থ দেয়া আছে। এই গ্রন্থানুযায়ী এ ধরনের দৃশ্য দেখার অর্থ হল, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ঐশী সমর্থন লাভ হবে।[১৫]

আমরা নিশ্চিত 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের মত বিজ্ঞপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি মির্যা সাহেবের বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়েছেন। আহমদীদের বিষয়ে তার মন্তব্য একথাই প্রমাণ করে। তিনি উদ্ধৃত পুস্তকের ৫৬৪ নম্বর পৃষ্ঠা পড়েছেন আর ৫৬৬ নম্বর পৃষ্ঠা পড়েন নি– এটি হতেই পারে না। নিশ্চয়ই তিনি পড়ে থাকবেন। সেক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নম্বর ৫৬৪-এর ভগ্নাংশ উল্লেখ করে বাকি অংশটুকু জনসমক্ষে উল্লেখ না করা ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করা নয় কি?

আপত্তি : মির্যা সাহেব বলেছেন, আমাকে বলা হল, তুমি যে কাজের ইচ্ছা কর তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।(রূহানী খাযায়েন ২২/১০৮)

উত্তর: এই ইলহামটি হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর দোয়া গৃহীত হবার দিকে ইঙ্গিত করছে। যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেন তারা নিদর্শন হিসেবে তাঁর পক্ষ থেকে দোয়ার কবুলিয়াত লাভ করে থাকেন। একেই **ফানা ফিল্লাহ্**-র স্তর বা পর্যায় বলা হয়। এই মকামে পৌঁছলে বান্দার আর নিজস্ব কোন বা বাসনা অবশিষ্ট থাকে না বরং তার সকল ইচ্ছা ও বাসনা মহাক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ নিজ অধিনস্থ করে নেন। যেমন বদরের যুদ্ধে যদিও মহানবী(সা.) কঙ্কর ছুড়ে মেরেছিলেন কিন্তু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **ওয়া মা রামায়তা ইয্ রামায়তা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা**। (সূরা আনফাল: ১৮) যদিও বাহ্যিকভাবে তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন কিন্তু আমি ঘোষণা দিচ্ছি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই তা ছুড়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিলিন 'ফানাফিল্লাহ' ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অধিনস্ত হয়ে যাওয়ায় আল্লাহ্ তার সদিচ্ছা পূর্ণ করে দেন। একথাই আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে মির্যা সাহেবকে জানিয়েছেন।

আপত্তি: দানিয়েল নবী তার কিতাবে আমার নাম মিকাইল রেখেছেন। আর ইব্রানী ভাষায় মিকাইল অর্থ খোদার মত। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/৪১৩)*

আব্দুর মজিদ আপত্তি করেঃ কাদিয়ানী ভাইরা বলবেন কি, সেই নবীদের বইগুলোর নাম ও পৃষ্টা নম্বর কত? মির্যা সাহেবকে মিথ্যার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উদ্ধৃতিগুলো প্রকাশ করা কাদিয়ানীদের জন্য জরুরী। মিকাইলের প্রকৃত অর্থ 'আল্লাহর বান্দা'। এখানে "আল্লাহর মত" বলে মির্যা সাহেব ভুল করেছেন। যেমন তিনি সফরকে চতুর্থ মাস বলে ভুল করেছেন। (রূহানী খাযায়েন ১৫/২১৮)

উত্তর: 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের পাণ্ডিত্য দেখে আফসোস হচ্ছে। মির্যা সাহেব লেখেছেন ইব্রানী ভাষায় মিকাইল-এর অর্থ খোদার মত আর 'আল্লামা' অন্য অবিধান থেকে অনেক গবেষণা করে বের করেছেন, মিকাইলের অর্থ আল্লাহর বান্দা। অবিধান বের করার জ্ঞানও যদি না থাকে তাহলে অন্যের পাণ্ডিত্য বিচার করতে কেন এলেন। যদি অবিধান বের করা শিখে ফেলতেন তাহলে আর

এভাবে লজ্জিত হতে হত না। ইব্রানী বা হিব্রু ভাষায় মিকাইল অর্থ খোদার মত। ইব্রানী তথা হিব্রু ভাষার অভিধানে মিকাইল-এর অর্থ কী দেয়া আছে দেখুন।

SH4317
4317 Miyka'el me-kaw-ale'
from 4310 and (the prefix derivative from) 3588 and 410; **who (is) like God**; Mikael, the name of an archangel and of nine Israelites:--Michael.[16]

উক্ত হিব্রু অভিধানে স্পষ্ট মিকাইলের অর্থ 'যে আল্লাহর মত' করা হয়েছে।

অতএব 'আল্লামা' আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের বিরোধিতায় আল্লাহর শাস্তির পাত্র হয়ে যাবেন না।

বাকি রইল দানিয়েল নবীর কোন বইয়ে এর উল্লেখ আছে? 'আল্লামা' নিশ্চয় বাইবেল পড়েছেন। বাইবেলেরে পুরাতন নিয়মের দানিয়েল অংশে ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে-

দানিয়েল নবী বলছেন, 'সেই সময় তোমার লোকদের রক্ষাকারী মহান স্বর্গদূত মীখায়েল তোমাদের পক্ষে দাঁড়াবেন। এমন একটা কষ্টের সময় উপস্থিত হবে যা তোমার জাতির আরম্ভ থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয় নি। ...পৃথিবীর মাটিতে ঘুমিয়ে থাকা অসংখ্য লোক তখন জেগে উঠবে। ...কিন্তু তুমি, দানিয়েল, শেষ সময় না আসা পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীর বইটা বন্ধ করে তার কথাগুলো সীলমোহর করে রাখ। সেই সময়ের মধ্যে অনেকে যেখানে সেখানে যাবে এবং জ্ঞানে বৃদ্ধি হবে। ... সেদিন থেকে নিয়মিত উৎসর্গ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং সর্বনাশা ঘৃণার জিনিষ স্থাপন করা হবে সেই দিন থেকে একহাজার দু'শো নব্বই দিন হবে। সেই লোক ধন্য যে অপেক্ষা করে এবং একহাজার তিনশো পয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকে।" (দানিয়েল ১২:১১-১২)

১২৯০ থেকে ১৩৩৫-এর একটি সংখ্যা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আশ্চর্যজনক হলেও সত্য বাস্তবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) ১২৯০ হিজরী সনেই প্রথম ইলহাম লাভ করেছিলেন। আর ১২৯০ থেকে ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই তাঁর জামা'তের বিকাশ, প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

শুধু হযরত দানিয়েল(আ.)-ই নন হযরত ঈসা(আ.)-ও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন: "আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত তোমরা এ কথা না বলবে, যিনি প্রভুর নামে আসছেন তার গৌরব হোক। সেই পর্যন্ত আর তোমরা আমাকে দেখতে পারবে না।" (মথি ২৩:৩৯)

তিনি আরো বলেন: "সেই সাহায্যকারী পবিত্র আত্মাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন" (যোহনের ১৪ অধ্যায়ের ২৫-২৬ শ্লোক)। অতএব 'আল্লামা'র আপত্তি কোন ভাবেই ধোপে টেকে না।

আপত্তি : 'আমি (আল্লাহ্) তোমাকে একজন ছেলের সংবাদ দিচ্ছি যার সাথে খোদা প্রকাশিত হবে। কেমন যেন আসমান থেকে খোদা অবতীর্ণ হবে। (রুহানী খাযায়েন ২২/৯৮-৯৯)

উত্তর: 'আল্লামা' আপনি এত জ্ঞানী পণ্ডিত হয়ে সাধারণ একটা উর্দূ-আরবী বাক্যের অনুবাদ করতে অক্ষম– এটাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? হযরত ইমাম মাহদী(আ.) অমুসলিমদের দাবীর প্রেক্ষিতে ইসলামের সপক্ষে একটি নিদর্শন চেয়ে হুশিয়ারপুরে চিল্লা করেছিলেন। উক্ত চিল্লার ফলে তিনি যে ঐশী সুসংবাদ লাভ করেছিলেন ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তিনি তা প্রকাশ করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত পুত্রের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এরই একটি কর্তিত অংশ আপনি উদ্ধৃত করে ভুল অনুবাদ করেছেন। মূল ইলহামটির উদ্ধৃত অংশের সঠিক রূপ হচ্ছে: **'মাযহারুল হাক্কি ওয়াল উলা কা আন্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামা'**। অর্থাৎ তিনি সত্যের বিকাশস্থল হবেন মনে হবে যেন আল্লাহ্ আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।

এ কথার অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.)-এর যাবতীয় ধর্মসেবার কাজ আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট হয়ে সম্পাদিত হবে। তাঁর কার্যকলাপে ঐশী সাহায্য সহযোগিতার এত বেশী নিদর্শন প্রকাশিত হবে যেন আল্লাহ্ স্বয়ং ঊর্ধ্বলোক থেকে ধরাপৃষ্ঠে নেমে এসেছেন বলে মনে হবে। বাস্তবে এমনটিই হয়েছিল। বাহান্ন বছরের খিলাফতকালে বাহ্যত অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে দেখানো- এটাই আল্লাহর অবতরনের বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া বুখারী শরীফসহ অন্যান্য সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহেও প্রতি রাতে আল্লাহ্র এই পৃথিবীতে নেমে আসার কথা সকলেরই জানা। আল্লাহ্র কোন পুণ্যবান বান্দা যদি তাঁর

সাহায্যপুষ্ট হয়ে কাজ করে এতেও আপত্তি! 'আল্লামা' কি এমন কোন মসীহ্ বা মাহ্দীর অপেক্ষায় রত যার খলীফাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না?

আপত্তিঃ কাজি মুহাম্মদ ইয়ার সাহেব বর্ণনা করেন, "হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) একবার নিজের অবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, **কাশফের অবস্থা এভাবে চেপে বসল যে, নিজেকে মহিলা মনে হল। আর আল্লাহ্ তা'লা পৌরষত্বের শক্তি আমার উপর প্রকাশ করছে।** জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।' (ইসলামী কুরবানী ট্রাক্ট নম্বর ৩৪)

উত্তরঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) নিজে কখনও একথা বর্ণনা করেন নি বা এমন কোন কাশফ বা দিব্য-দর্শনের কথা প্রকাশ করে যান নি। অন্য কারো বর্ণনা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। উক্ত কাশফের বর্ণনা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কোন খলীফাও করেন নি। অতএব, এদিক থেকেও এই আপত্তি ধোপে টেকে না। কথায় বলে ডুবন্ত ব্যক্তি খরকুটা ধরে বাঁচতে চায়। আপত্তিকারী 'আল্লামা'-র দশাও ঠিক এমনই। আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য এখন তিনি পাগলের প্রলাপের আশ্রয় নিয়েছেন।

সবার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে 'ইসলামী কুরবানী ট্রাক্ট' হযরত মির্যা সাহেবের বা তাঁর কোন খলীফার লিখিত কোন পুস্তক বা বক্তব্য নয় এবং এ পুস্তিকাটি আহমদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিতও নয়। 'ইসলামী কুরবানী ট্রাক্ট' পুস্তিকাটি লিখেছেন কাজি মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব।

কাজি মোহাম্মদ ইয়ার সাহেব কে ছিলেন? তিনি ছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি। কাজি মোহাম্মদ ইয়ার সাহেবের ভারসাম্যহীন হবার কথা কেবল আমরা এখন বলছি না বরং গোড়া থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ের ছোট বড় সব আহমদী তাকে মানসিকভাবে রোগাক্রান্ত বলেই জানতেন।

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ উক্ত উদ্ধৃতির মূল কপি যখন ছাপালেন তখনও একটু কষ্ট করে এর পরের কয়েকটি লাইন পড়ে দেখেন নি। তা না হলে তিনি এ আপত্তি নিশ্চয়ই ছাপাতেন না। 'আহমদী বন্ধু' পুস্তকের শেষের দিকে ৭৭/৭৮ পৃষ্ঠায় ইসলামী 'কুরবানী ট্রাক্ট' লিফলেটটির উদ্ধৃত পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ছেপে দেয়ার

জন্য 'আল্লামা'আব্দুল মজিদকে ধন্যবাদ, কেননা আপত্তি হিসাবে উদ্ধৃত লাইনটির নীচের লাইনেই স্বয়ং লেখকের এমন বক্তব্য বিদ্যমান যার দ্বারা তার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হবার বিষয়টি স্পষ্ট প্রতিয়মান হয়।

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ খুব ভালভাবে জানেন, বর্ণনা গ্রহণ করার সময় বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা একটি প্রধানতম শর্ত। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রাবী বা বর্ণনাকারীর নৈতিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচার করা হয়। শত-সহস্র হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বিচার করার জন্য 'আসমাউর রিজালের' নীতি ও শর্ত প্রয়োগ করবেন কিন্তু মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে গিয়ে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ এটি বেমালুম ভুলে যাবেন- এটি কেমন বিচার?

আপত্তিঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বারা দ্বীন প্রচারের কাজ পরিপূর্ণভাবে হয়নি। তিনি পূর্ণ প্রচার করেননি। আমি পূর্ণ করেছি। *(রূহানী খাযায়েন ১৭/২৬৩, দ্র. টিকা)*।

উত্তরঃ যেভাবে 'আল্লামা' লিখেছেন হযরত মির্যা সাহেব সেভাবে বিষয়টিকে বলেন নি। তিনি লিখেছেন, "যেহেতু মহানবী(সা.)-এর প্রতি অর্পিত দ্বিতীয় আবশ্যকীয় দায়িত্ব ছিল, হেদায়েতের প্রচার ও প্রসারের কাজকে পূর্ণতা দান করা কিন্তু মহানবী(সা.)-এর যুগে প্রচার মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ না থাকায় এ কাজ বাস্তবায়ন অসম্ভব ছিল। এজন্যই পবিত্র কুরআনের আয়াত **'ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম'**-এর মাঝে হুযূর(সা.)-এর পুনরায় আগমনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। যেন তাঁর প্রতি অর্পিত দ্বিতীয় আবশ্যকীয় দায়িত্ব অর্থাৎ হেদায়েতের পূর্ণ প্রচার ও প্রসারের কাজ সম্পন্ন হয় যা তাঁর হাতেই সম্পন্ন হবার কথা ছিল। প্রাথমিক যুগে উপায়-উপকরণ না থাকায় এটি সম্পন্ন হয় নি। অতএব এই গুরুদায়িত্বকে মহানবী(সা.) তাঁর বুরুযী তথা রূপক আগমনের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন আর এমন এক যুগে এসে তা সম্পন্ন করেছেন যখন বিশ্বের সকল জাতিতে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।" (রূহানী খাযায়েন ১৭শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩ পাদটিকা দ্রষ্টব্য)

এ বক্তব্য পাঠ করে ভাল করে বুঝতে পারছেন, এতে হযরত মির্যা সাহেব রসূল(সা.)-কে খাটো করেন নি বরং তাঁর(সা.) বুরুযী আগমনের মাধ্যমে রসূলুল্লাহরই আধ্যাত্মিক বিকাশ হিসাবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। অথচ

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন মির্যা সাহেব মহানবী(সা.)-এর বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন।

মুহাম্মদ(সা.) হলেন শরীয়তবাহক শেষ নবী, পূর্ণাঙ্গীন নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর মাধ্যমে শরীয়ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং খোদার পক্ষ থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। হযরত মির্যা সাহেব তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর দাসত্বে সেই শরিয়তের বাণী ও শিক্ষাকে জগতময় ছড়িয়ে দেয়ার ও প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। বিষয়টি মালিক ও কামলার ন্যায়। মহানবী(সা.) হলেন মালিক। আর একজন কামলা তার মালিকের সম্পদ কাঁধে করে গন্তব্যে পৌঁছে দিচ্ছে। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব তাঁর দাবী সম্পর্কে জানেন কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব বক্তব্য খণ্ডিত ও বিকৃতভাবে জনগণের মাঝে দূরভিসন্ধিমূলকভাবে ছড়াচ্ছেন।

আপত্তি : যিল্লি (ছায়া) নবুওয়াত মসীহ মওউদের (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর) পা-কে পিছনে সরায়নি। বরং সামনে বাড়িয়েছে এবং এত সামনে বাড়িয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাঁধ বরাবর এনে দাঁড় করিয়েছে। *(কালিমাতুল ফসল ১১৩)*

উত্তর: 'আল্লামা' হযরত মসীহে মওউদ (আ.) বা তাঁর খলীফাদের বক্তব্য বা লেখায় আপত্তি করার মত কিছু না পেয়ে শেষে এমন সব পুস্তক বা রচনা থেকে আপত্তি উত্থাপন করছেন যেগুলো আমাদের জন্য হুজ্জত নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের নীতিগত কথা হল, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর লিখিত রচনা ও পুস্তকাবলী আমাদের জন্য হুজ্জত এবং তার পরে তার খলীফাগণের রচনাবলি বা তাদের বক্তব্য আমাদের জন্য হুজ্জত। এর বাইরে কে কী মন্তব্য করেছে আর কি বলেছে তার উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। কেননা সেগুলো তাদের ব্যক্তিগত অভিমত ও বিশ্লেষণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। আহমদীয়া জামা'তের বক্তব্য সেটাই যেটা হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) বা তাঁর কোন খলীফা বর্ণনা করেছেন।

বাকি রইল উদ্ধৃত বক্তব্যের তাৎপর্য- এ কথা সবারই জানা, ছায়া তার কায়া অনুসারেই হয়ে থাকে কিন্তু ছায়া নিজে থেকে কোন পরিবর্তন নিজের মাঝে সাধন করতে পারে না। উক্ত উদ্ধৃতিটিকে আপত্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে

অথচ এটি হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতা প্রমাণ করে।কায়ার সম্পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণই হল ছায়ার ধর্ম। তাই যেখানে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) মহানবী(সা.)-এর ছায়া হবার দাবী করছেন এর ব্যাখ্যা উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী জনসাধারণের না বোঝার কথা নয়। ছায়ার নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি থাকে না বরং কায়া যেভাবে চায় সেভাবেই পরিচালিত হয়। মির্যা সাহেবের যিল্লি নবুওতের মূল তাৎপর্য এটিই। 'কাঁধের সমান দাঁড়িয়েছেন'- একথা দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি রসূলুল্লাহ(সা.)-এর শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত ছিলেন, তাঁর ছাত্র ছিলেন এবং পূর্ণাঙ্গীন অনুসারী ছিলেন। তা না হলে বলা হত, তাঁর মাথা ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে গেছেন।

দেওবন্দের আলেমরা এই স্থুল বিষয়টিও বুঝবেন না–এটা হতে পারে না। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ নিশ্চয় এমন যিল্লি হবার বিষয়ে তাত্ত্বিক ও মারেফাতের জ্ঞান রাখেন। কিন্তু এসত্ত্বেও তিনি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

আপত্তিঃ তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের তেজোদ্দীপ্ত কিরণ প্রকাশের সময় নেই। অর্থাৎ তাঁর দাপুটে রং-এর কোন খেদমত বাকী নাই। সে তার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দাপট প্রকাশ করেছে। **এখন আর সূর্যের কিরণ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন) সহ্য হচ্ছে না। এখন (সূর্য ডুবার পর এবং) পূর্ণিমার রাতের শীতল ও কোমল আলোর প্রয়োজন। যা আহমদের রং (কাদিয়ানী ধর্মমতের রং-এ) আমার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।** (রূহানী খাযায়েন ১৭/৪৪৫)

উত্তর : এখানে আল্লামা আব্দুল মজিদ বিকৃতভাবে একটি খণ্ডিত উদ্ধৃতি তুলে আপত্তি করেছেন। এ ক্ষেত্রে পাঠক মূল উদ্ধৃতি পড়লেই বুঝতে পারবেন মির্যা সাহেব মোটেও আপত্তিকর কোন কথা বলেননি।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আ.) বলেন,

“তোমরা শুনেছ আমাদের নবী(সা.)-এর দু’টি নাম রয়েছে। একটি হলো মুহাম্মদ(স.)। আর এ নাম তওরাতে লেখা রয়েছে। এটা এক প্রতাপ বিকাশী শরীয়ত -যেমনটি এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ... ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ

দ্বিতীয় নাম আহমদ(সা.)। আর এ নাম ইঞ্জিলে রয়েছে, যা আত্মিক সৌন্দর্য বিকাশী এক ঐশী শিক্ষা। যেমনটি এই আয়াত থেকে প্রতিভাত হয়।

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

আর আমাদের নবী(স.) জালাল (প্রতাপ) ও জামাল (স্নিগ্ধতা/ঐশী সৌন্দর্য বিকাশী) দু’টিরই সমন্বিত রূপ ছিলেন। মক্কার জীবন স্নিগ্ধতার রঙে ছিল। আর মদিনার জীবন ছিল প্রতাপ বিকাশী। পরবর্তীতে এই দুই গুণাবলী উম্মতের জন্য এভাবে বণ্টন করা হয় যে, সাহাবায়ে কেরামদের(রা.) প্রতাপ বিকাশী জীবন দান করা হয়। আর আত্মিক সৌন্দর্য বিকাশী জীবনের জন্য মসীহ্ মাওউদকে মহানবী(স.)-এর বিকাশস্থল আখ্যায়িত করা হয়। এ কারণেই তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে **ইযাউল হারব** অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ করবেন না। আর এটা পবিত্র কুরআনে খোদা তা’লার অঙ্গীকার ছিল -এই অংশের পূর্ণতার জন্য মসীহ মাওউদ ও তাঁর জামা’তের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হবে। যেমনটি **‘ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম’**-আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে আর **‘তাযাআল হারবু আওযারাহা’** আয়াতেও এই ইঙ্গিতই রয়েছে। অতএব মন দিয়ে শোন! তেরশ’ বছর পর জামালী অর্থাৎ ঐশী সৌন্দর্য বিকাশী দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা খোদার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা স্বরূপ যেন তিনি তোমাদের যাচাই করে দেখেন তোমরা উপরোক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে কেমন। তোমাদের পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম(রা.) প্রতাপ বিকাশী জীবনের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে প্রদর্শন করেছেন। কেননা, তা এমনই এক যুগ ছিল যখন প্রতিমার সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং সৃষ্টি-পূজার সমর্থনে বিশ্বাসী মু’মেন বান্দাদেরকে গরু-ছাগলের মত জবাই করা হতো। আর পাথর, তারকারাজি, উপলক্ষ্য ও উপকরণ এবং অন্যান্য সৃষ্টিকে খোদার আসন দেয়া হয়েছিল। অতএব এটা নিঃসন্দেহে জিহাদের যুগ ছিল। যারা অত্যাচার-নির্যাতনের উদ্দেশ্য তরবারি ধারণ করতো তাদেরকে যেন তরবারির মাধ্যমে হত্যা করা হয়। তাই সাহাবা(রা.) তরবারি ধারণকারীদের তরবারি দ্বারাই নিবৃত্ত করেছিলেন। আর ‘মুহাম্মদ’ নামের মাঝে যে প্রতাপ এবং প্রেমাষ্পদের মহিমা বিকাশী বৈশিষ্ট্য

বিদ্যমান তার বিকাশের ক্ষেত্রে তারা চরম দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। আর ধর্মের সাহায্যের জন্য নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। এর পরবর্তীকালে সেই মহা মিথ্যাবাদীদের জন্ম হয় যারা 'মুহাম্মদ' নামের প্রতাপ বিকাশী ছিল না। বরং যাদের বেশির ভাগ চোর, ডাকাতের মত ছিল। যারা আমার পূর্বে গত হয়েছে। তারা মিছেমিছি 'মুহাম্মদী' নামে আখ্যায়িত হতো। আর সাধারণ মানুষ তাদের স্বার্থপর বলেই মনে করতো।

বর্তমানেও সীমান্ত প্রদেশের কিছু সংখ্যক অজ্ঞ এই একই ধরনের মৌলভী প্রদত্ত শিক্ষায় প্রতারিত হয়ে 'মুহাম্মদী' প্রতাপ বিকাশের নামে লুট-পাট করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে রেখেছে। আর প্রতিদিন তারা অন্যায়ভাবে রক্তপাত ঘটায়। কিন্তু তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শোন! এখন 'মুহাম্মদ' নামের প্রতাপ প্রকাশের যুগ নয় অর্থাৎ এখন প্রতাপ বিকাশী কোন সেবা প্রদানের সুযোগ নেই। কেননা সেই প্রতাপ যথোপযুক্তভাবে প্রকাশিত ও বিকশিত হয়ে গেছে। এখন প্রতাপদীপ্ত সূর্য কিরণ সহনীয় নয়। এখন প্রয়োজন চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোতির। **আর আহমদ(স.)-এর রঙে রঙিন হয়ে আমি সেই জ্যোতি। আর এখন সেই আহমদ(স.)-এর রঙ প্রকাশের যুগ। অর্থাৎ স্নিগ্ধতা বিকাশী ধর্মীয় সেবা প্রদানের সময়। আর এটি চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রদানের যুগ।"**

হযরত মির্যা সাহেব, এখানে রসূলুল্লাহ(সা.)-এরই চলমান স্থায়ী কল্যাণ বিকাশের কথা বলেছেন। কেবল ধর্ম-সেবার ধরন ভিন্ন। একটি ছিল দ্যদীপ্যমান সূর্যের প্রখর রশ্মির মত আর বর্তমান যুগটি হচ্ছে পূর্ণিমার কোমল স্নিগ্ধ জ্যোতির ন্যায় সেবা প্রদানের যুগ।

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর বিরুদ্ধে এই উদ্ধৃতিকে দাঁড় করানোর জন্য এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কয়েকটি ব্রেকেটে **নিজের মনগড়া বক্তব্য সংযোজন করেছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি এ ধরনের কোন** ব্রেকেট **লেখক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) তাঁর লেখায় ব্যবহার করেন নি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির দুরভিসন্ধি কী এটা 'আল্লামা' আব্দুল মজিদই বলতে পারবেন। তবে আর যাই হোক উদ্দেশ্য যে অসৎ আশা করি পাঠকদের এটা বুঝতে অসুবিধা হবে না।**

আপত্তি : এটা একটি সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী কথা যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই (আধ্যাত্মিকতার পথে)উন্নতি করতে পারে এবং উচ্চাসনে সমাসীন হতে পারে। এমনকি **মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও সামনে বেড়ে যেতে পারে।** *(আল-ফযল ১৭-৭-১৯২২)*

উত্তর: আধ্যাত্মিকতার মাঠে দৌড় প্রতিযোগিতায় কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সবার জন্য আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত রাখা আছে। উন্নতির কোন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয় নি। যার ইচ্ছা সে উন্নতির পথে নির্দ্বিধায় ছুটতে পারে। বাঁধা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আধ্যাত্মিক দৌড়ের ক্ষেত্রে বাজিমাত করে দিয়েছেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)। কিন্তু জয়ী হবার পর দৌড়ের মাঠ বন্ধ করে দেয়া হয় নি বরং তা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এ বিষয়টিই উপরোক্ত দৃষ্টান্তের আকারে বুঝিয়েছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.)। তবে কেউ যে তাকে ডিঙাতে পারে না এ কথাও স্পষ্ট। কেননা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তা'লাই স্পষ্টভাবে মুহাম্মদ(সা.) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি (সা.) হলেন খাতানান্নাবীঈন এবং মুহাম্মদ(সা.)ই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি উন্নতি করতে করতে সিদরাতুল মুনতাহায় (আত্মিক উন্নতির চরম শিখরে) পৌঁছেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ কাউকে বাধা দিয়ে তাঁকে উন্নতি প্রদান করেছেন– বিষয়টি এমন নয় বরং উন্নতির সকল পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকা অবস্থাতেই মুহাম্মদ(সা.) শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত হয়েছেন। এ কথাটিই এখানে বলা হয়েছে।

আপত্তি : **আমার আলামত দশ লক্ষ। (রুহানী খাযায়েন ২১/৭২) রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর মু'জিযা তিন হাজার।** (রুহানী খাযায়েন ১৭/১৫৩)

উত্তর: হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর দাসত্বে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে দাবি করেছেন। আর আল্লাহকে এ যুগে লাভ করার একমাত্র পথ হিসেবে মহানবী(সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও অনুগমনকে তিনি বার বার তাঁর পুস্তকাদিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের আয়াতের সাথে হুবহু মিল খায়। সূরা আলে ইমরানের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র ভালোবাসা চাও তাহলে আমার অনুকরণ অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

অতএব মুহাম্মদ(সা.)-এর পর আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র পথ হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর আনুগত্য। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর দ্যার্থহীন বক্তব্য শুনুন, 'আমাদের নবী(সা.)-এর পক্ষ থেকে যত মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে আর কোন নবীর পক্ষ থেকে এতটা প্রকাশিত হয় নি। ... আমাদের নবী(সা.)-এর মোজেযা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এসব মোজেযা প্রকাশিত হতে থাকবে। **আর আমার সমর্থনে যেসব মোজেযাই প্রকাশিত হচ্ছে তার সবই মূলত মহানবী(সা.)-এরই মোজেযা'** (তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহীঃ পৃষ্ঠা ৩৫)।

অতএব হযরত মির্যা সাহেবের নিজস্ব কোন নিদর্শন নেই সব নিদর্শনই হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর বরকত বা কল্যাণে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন।

হযরত মির্যা সাহেবের প্রত্যেকটি দোয়ার কবুলিয়াতের ঘটনা একটি নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাদিয়ানে আগত প্রত্যেকটি ব্যক্তি একেকটি নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'লা নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পূর্ণতায় প্রত্যেকটি সাহায্য সহযোগিতার ঘটনা একেকটি নিদর্শন। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আহমদীয়া জামা'তের বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি একটি নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদী নেতা কর্মীর মৃত্যু বা ধ্বংস একেকটি নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্লেগের আক্রমণে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি একেকটি নিদর্শন। বিভিন্ন স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসের প্রতিটি ঘটনা একেকটি নিদর্শন। কিন্তু এসব নিদর্শন তখনই নিদর্শন বলে সাব্যস্ত হবে যখন মির্যা সাহেব নিজে মুহাম্মদ(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হবেন। আর তখন এসব আর মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর নিদর্শন থাকবে না বরং সবই মুহাম্মদ(সা.)-এর মহান নিদর্শন বলে প্রমাণিত হবে কেননা দাসের নিজস্ব কোন সম্পত্তি নাই যা আছে সবই মুহাম্মদ(সা.)-এর। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেন,
সাব হামনে উসসে পায়া শাহেদ হে তু খুদায়া ওহ জিসনে হাক দিখায়া ওহ মাহলাকা এহী হ্যায়।

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ হযরত মির্যা সাহেবের এসব বক্তব্য খুব ভাল করেই জানেন। কেননা মির্যা সাহেবের সব লেখাই তিনি পড়েছেন বলে তার সমালোচনার হাবভাবে প্রতিয়মান হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের রূহানী খাযায়েনের দুই খণ্ডের দু’টি পৃথক উদ্ধৃতিকে এমনভাবে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন যেন মানুষ মনে করে মির্যা সাহেব নিজেকে মুহাম্মদ(সা.)-এর বিপক্ষে বড় করে দেখিয়েছেন। অথচ মির্যা সাহেব ইমাম মাহদী হিসাবে নিজেই মহানবী(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর জ্বলন্ত নিদর্শন। তাই ইমাম মাহদী হিসেবে তাঁর সকল নিদর্শন মূলত মহানবী(সা.)-এর নিদর্শন বলে গণ্য হবে এবং এতে মহানবী(সা.)-এরই মর্যাদা উন্নীত হতে থাকবে।

আপত্তি : ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ সাহেব ‘অযথা বিভ্রান্তি’ পুস্তকের উল্লেখ করে বলেছেন, **মির্যা সাহেব বলেছেন, আলামাত, মোজেযা, কারামাত এবং খর্‌কে আদত সব একই (রুহানী খাযায়েনঃ ২১/৬৩)** আর উপরোক্ত পুস্তকের প্রণেতা এর বিপরীত কথা বলেছেন। প্রণেতা বলেছেন, আলামাত আর মোজেযা এক জিনিষ নয়।

উত্তর: ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ খুবই সূক্ষ্মভাবে এখানে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) রুহানী খাযায়েন-২১/৬৩-এর উক্ত উদ্ধৃতিতে কোথাও ‘আলামত’ শব্দটি ব্যবহার করেন নি। ‘আল্লামা’ ভেবেছেন বাঙালি কি আর উর্দূ আরবী পড়ে দেখবে নাকি। মিথ্যার আশ্রয় নিলে এভাবেই লজ্জিত হতে হয়।

আপত্তি : **‘দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে নবুওয়তের দরজা খোলা’।** (হকীকাতুন নবুওয়াহ, পৃ. ২২৮)

উত্তর: পবিত্র কুরআন এক ধরনের নবুওতের পথ রুদ্ধ ঘোষণা করেছে আবার আরেক ধরনের নবুওতের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। যে নবুওতের পথ রুদ্ধ সেটি হচ্ছে স্বয়ং স্বনির্ভর শরীয়তবাহী নবুওত। যেমন আল্লাহ তা’লা সূরা মায়েদার একেবারে প্রারম্ভেই ৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ ...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।... (সূরা মায়েদাঃ ০৪)

এদ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর মাধ্যমে শরীয়তবাহী স্বয়ং-সম্পূর্ণ নবুওতের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু একইসাথে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির পথ এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক ধরনের নবী বা রসূল আগমনের পথ খোলা আছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, সূরা নিসার ৭০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন,

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

আর যে আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন (অর্থাৎ এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। আর এরাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম। (সূরা নিসাঃ ৭০)

আরও দেখুন সূরা আরাফ ৩৬ নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ তা'লা আদম সন্তানদের মাঝে তাঁর পক্ষ থেকে রসূল আসতে পারে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সূরা নিসার আয়াতটিতে কড়া শর্ত আরোপ করে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর আনুগত্য করবে কেবল তারাই আধ্যাত্মিকতায় পরমত্ব ও চরমত্ব লাভ করবে। বোঝা গেল, এখন আর নিজ যোগ্যতায় কেউ নবী হতে পারবে না বরং 'খাতামান নবীঈনের' পূর্ণ আনুগত্যে মুসলমানরা তা লাভ করতে পারবে। একেই আনুগত্যকারী বা উম্মতী নবুওত বলা হয়। 'আল্লামা' মজিদ এবং তার শিক্ষকরাও একথা মানেন, খাতামান নবীঈন(সা.)-এর পর ঈসা নবীউল্লাহ জগতে আসবেন (মসলিম শরীফ, কিতাবুল ফিতান ও ইবনে মাজা শরীফের ফিতনা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। একথাই হকীকাতুন নবুওতে বলা হয়েছে।

সুধী পাঠক! আমরা হকীকাতুন নবুওত পুস্তক থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি তুলে ধরলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ(রা.) বলেছেন:

"মহানবী(সা.)-এর পর দুই ধরনের নবুয়্যতের দ্বার রুদ্ধ। অর্থাৎ শরীয়তবাহী নবুয়্যত এবং স্বাধীন সয়ংসম্পূর্ণ সতন্ত্র নবুয়্যত। মহানবী(সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে নবুয়্যত লাভ হতে পারে। ...কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় নবুয়্যত কীভাবে লাভ হতে পারে এটি জানা জরুরী। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেন,

‘কেউ যদি এই খাতামান্নাবীঈন(সা.)-এর সত্তায় এমনভাবে বিলিন হয়ে একাকার হয়ে যায় এবং এই সত্তা ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে যায় তাহলে এর ফলে তাঁরই নাম সে লাভ করে ফেলে। আর স্বচ্ছ দর্পনের ন্যায় মুহাম্মদী রূপের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার মাঝে পড়লে খতমে নবুয়্যতের মহর ভঙ্গ না করেও নবী নামে আখ্যায়িত হবে।’ (এক গালাতী কা ইযালা, রূহানী খাযায়েন ১৮শ খণ্ড পৃষ্ঠা ২০৯)

তিনি(রা.) আরো বলেন, ‘প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র নবুয়্যত প্রতিবিম্বস্বরূপ কেননা সে মহানবী(সা.)-এর পূর্ণ বুরুয বা প্রতিচ্ছায়া হবার কারণে নবুয়্যতের মূল উৎস থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে নবী নামে আখ্যায়িত হবার যোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।’

অতএব, রসূল(সা.)-এর পর একধরনের নবী আসায় কোন আপত্তি হতে পারে না। আর এদিকেই উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা(রা.), মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী এবং সাম্প্রতিক কালের মওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতবী সাহেব ইঙ্গিত করেছেন।

আপত্তি : মুহাম্মদ পুনরায় আগমন করেছেন আমাদের মধ্যে। এবং পূর্বের থেকেও নিজ মর্যাদায় আরও বেশি অগ্রগতি অর্জন করেছেন। যে পূর্ণাঙ্গ মুহাম্মদকে দেখতে চাও সে কাদিয়ানে গোলাম আহমদকে দেখে যাও। (কাব্যের অনুবাদ) *(বদর, কাদিয়ান, ২৫-১০-১৯০৬)* তাহলে কাদিয়ানী বন্ধুদের নিকট কি মির্যা সাহেব পূর্ণাঙ্গ আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপূর্ণাঙ্গ। উল্লেখ্য, বদর কাদিয়ানীদের সম্পাদিত উর্দূ পত্রিকা।

উত্তর : কাজী আকমল সাহেবের একটি পংক্তি তুলে ধরে পুরনো কাশুন্দি ঘেটেছেন আমাদের ‘আল্লামা’ সাহেব। এই উদ্ধৃতিতে কাজী আকমল সাহেবের কবিতার যে পঙক্তির উল্লেখ করা হয়েছে এই অংশটি হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানি(রা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেছেন, এ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো অপছন্দনীয় এবং রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর জন্য অবমাননাকর। (আলফজল ১৯শে আগষ্ট ১৯৩৪ পৃষ্ঠা নম্বর ৫)। অতএব ‘আল্লামা’ প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা বহু পূর্বেই সে কথা বলে দিয়েছেন। এ নিয়ে আমাদের মাঝে দ্বিমত নেই। প্রায় শত বছর ধরে বিরুদ্ধবাদীদের এই উত্তর দেয়া হচ্ছে ‘আল্লামা’ তাহলে জেনে-বুঝে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন!

আপত্তিঃ ‘এই ওহীতে আল্লাহ্ আমার নাম মুহাম্মদ রেখেছেন।’
(রুহানী খাযায়েন ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭)

উত্তর: এতে আপত্তির কী আছে? মুহাম্মদ(সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্যকারীর নাম যদি স্বয়ং আল্লাহ মুহাম্মদ রেখে দেন এতে আপত্তির করা অবান্তর। বরং আপত্তি তখন হত যখন তিনি মুহাম্মদ নাম রাখতে অস্বীকার করতেন। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক শহরে অগণিত মানুষের নাম মুহাম্মদ। আত্মীয় স্বজনের মাঝে খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে কী বিশাল সংখ্যায় মানুষের নাম মুহাম্মদ।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক নবজাত শিশু-পুত্রদের নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে *(দি গার্ডিয়ান ও দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১লা ডিসেম্বর-২০১৪)*। মানুষ মানুষের নাম মুহাম্মদ রাখলে আপত্তি হয় না কিন্তু মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রেমে বিভোর এক প্রেমিকের নাম আল্লাহ্ তা'লা ‘মুহাম্মদ’ রাখলে এটি আপত্তির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কেন? কেননা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ কারো মাঝে মুহাম্মদী গুণাবলী দেখে তার নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখতেই পারেন। কিন্তু যদি মির্যা সাহেব নিজেও নিজের নাম মুহাম্মদ রেখে থাকেন, এতেও অ-আহমদীদের আপত্তি করার কিছু নেই। কেননা নিজের নাম মুহাম্মদ রেখে তিনি নিজেকে মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রেমিক সাব্যস্ত করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন, কোন সনাতনী বা কোন ইহুদী বা খ্রিস্টান কখনও নিজের নাম মুহাম্মদ রাখে না। যে তাঁকে(স.) ভালবাসে কেবল সে-ই এ নাম রাখতে পছন্দ করে। **ফা'তাবিরূ ইয়া উলিল আলবাব**। অতএব মানুষ তাদের পুত্র সন্তানদের নাম মুহাম্মদ রাখলে দোষের কিছু নেই বরং আমরা গর্ব বোধ করি কিন্তু আল্লাহ্ তার কোন প্রিয় বান্দার নাম মুহাম্মদ রাখলে অনেকের সহ্য হয় না। আশ্চর্যের বিষয়!!

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ হযরত মির্যা সাহেবের শত্রুতায় এতটাই অন্ধ যার ফলে তিনি কথার মারপ্যাঁচে হযরত সাহেবের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তিনি তার পুস্তকের ৪০/৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় একটি উপমা উপস্থাপন করে দেশের এক সফল রাষ্ট্রপতির সাথে পরবর্তীতে আগমনকারী আরেকজনের তুলনা করতে গিয়ে সত্য বিষয়টিকে ঘোলাটে করে ফেলেছেন। হযরত মির্যা সাহেব রসূলের প্রতিবিম্ব হবার দাবী করেছেন। মহানবী(সা.)-কে নিজের প্রতিবিম্ব বলেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কায়া এবং নিজেকে তাঁর ছায়া বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সা.)-কে তিনি বলেছেন সূর্য আর নিজেকে বলেছেন চন্দ্র।

অতএব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির উপমাটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য উল্টোভাবে দেয়া হয়েছে। আর রাষ্ট্রপতির উপামা দেয়াই এখানে রসূল(সা.)-এর শানের পরিপন্থি কেননা আমাদের প্রিয় রসূল(সা.)-এর মর্যাদা জাগতিক রাষ্ট্রপ্রতির চেয়ে শত-কোটিগুণ ঊর্ধ্বে। হযরত মির্যা সাহেবের বক্তব্য শুনুন, **ইঁ বাহরে রাওয়াঁ বাখালকে খোদা দাহম এক কাতরায়ে যে বেহরে কামালে মুস্তাফা আসত**। তুমি এখন যে নিদর্শন ও ঐশী সমর্থনের প্লাবন বয়ে যেতে দেখছ এটি আমার মুনিব ও নেতা হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর মহাসমুদ্রের এক বিন্দু পানি মাত্র।
আরও বলেছেন,

ওহ পেশওয়া হামারা জিসসে হে নূর সারা
নাম উসকা হে মুহাম্মদ দিলবার মেরা এহি হ্যায়।

উস নূর পার ফিদা হুঁ উসকা হি ম্যায় হুয়াঁ হুঁ
ওহ হে ম্যায় চীয কিয়া হুঁ বাস ফায়সালা এহী হ্যায়।

'আল্লামা' সাহেব নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনি যতই উদাহরণ দিন এই মানদণ্ডে ধরা পড়বে এবং পরাস্ত হবে। মহানবী(সা.)-এর চেয়ে বড় আর কেউ নেই এবং হতেই পারে না।

আপত্তি : ইউরোপের লোকদের মদ এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণ হল, হযরত ঈসা(আ.) মদ পান করত। তা কোন রোগের কারণে বা পুরাতন অভ্যাস থাকার কারণে। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/৭১)*

উত্তর : 'আল্লামা' আব্দুল মজিদকে এমন একটি আপত্তি উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ। কেননা উপরোক্ত বক্তব্য যদি মির্যা সাহেব সত্যিই ঈসা(আ.)-এর প্রতি আরোপ করে বলেই থাকেন তাহলে কমপক্ষে মির্যা সাহেবকে আর কখনও খ্রিস্টানদের দালাল বা তাদের রোপিত চারাগাছ বলার সুযোগ থাকছে না। কেননা যে যার দালাল হয় সে তার মালিকের নিন্দা জ্ঞাপন করতে পারে না।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর বিরুদ্ধে নবীদের মর্যাদাহানীর যে অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে– এটিও একটি বানোয়াট আপত্তি। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)কখনও নবীদের কোন ধরনের অসম্মান বা অপমান করেন নি। বরং তিনি তাঁর সব লেখায় নবীদের সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত

রেখেছেন আর নবীদের বিরুদ্ধে আরোপিত সব অপবাদ থেকে তাঁদের পুতঃপবিত্র ও নিষ্পাপ সাব্যস্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলেছেনঃ **সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করাকে আমি আমার ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করি।** (মলফুযাত প্রথম খন্ড, ৪২০)

পাঠক! যিনি নিজে বলছেন, 'সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করাকে আমি আমার ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করি'– তিনি কীভাবে তাঁদের অপমান ও অপদস্থ করতে পারেন?

আপত্তিকর বক্তব্য হিসেবে উত্থাপিত লেখাটি যুক্তিতর্কের একটি বিশেষ জোরালোরূপ হিসেবে হযরত মির্যা সাহেব অবলম্বন করেছিলেন। অনুরূপ ধারালো বক্তব্য মহানবী(সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) সারাটি জীবন প্রদান করেছেন। সমালোচকদের তীর্যক আপত্তির প্রত্যুত্তর তাদেরই স্বীকৃত ঐশী গ্রন্থাবলীর বক্তব্য তুলে ধরে উত্তর প্রদান করাটি ছিল মির্যা সাহেবের একটি অভিনব বৈশিষ্ট। এখানেও সেই রীতিটিই লক্ষনীয়।

তাঁর যুগে ফতেহ মসীহ্‌নামের এক খ্রিস্টান পাদ্রি মহানবী(সা.)-কে অপমান করে তাদের কল্পিত 'ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বর যিশুর' শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। এর প্রত্যুত্তরে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) তাদের ইঞ্জিলের 'কল্পিত' ঈশ্বরপুত্র যিশুর স্বরূপ প্রদর্শন করেছেন মাত্র!

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) তাঁর রচিত নূরুল কুরআন-২ পুস্তকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন,

"পাঠকদের স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, হযরত ইসা(আ.) সম্পর্কে আমার বিশ্বাস খুবই উন্নত আর আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহ্ তা'লার সত্য নবী এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন ছিলেন। ... **আমি আমার তর্কযুদ্ধে প্রতিটি স্থানে খ্রিস্টানদের কল্পিত যিশুকে বুঝিয়েছি আর আল্লাহ্ তা'লার এক নিরীহ বান্দা ইসা ইবনে মরিয়ম যিনি নবী ছিলেন, যার কথা কুরআনে বর্ণিত আছে– আমি আমার এসব সম্বোধনে ঘুনাক্ষরেও তাঁর কথা বলি নি**। আর আমি এই রীতিটি টানা চল্লিশ বছর ধরে পাদ্রিদের অকথ্য গালাগালি শুনে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি।" *(নূরুল কুরআন-২, রূহানী খাযায়েন ৯ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৭৫)*

জানা গেল, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঈসা(আ.)-কে অবমাননা করা তো দূরের কথা এখানে তাঁর কোন উল্লেখই নেই বরং তাদের কল্পিত খোদার অসারতা তাদের গ্রন্থাদি থেকে তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

আপত্তি : হযরত মির্যা সাহেবের আধ্যাত্মিক মান ও মর্যাদা এত বড় হয় কীভাবে? তিনি মুহাদ্দাসদের চেয়েও বড় মর্যাদার অধিকারী হন কীভাবে? তিনি নবীদের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন কীভাবে? রসূলুল্লাহর পূর্ববর্তী নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হন কীভাবে?

উত্তর : সবচেয়ে বড় নবীর গোলামও অন্যান্যদের চেয়ে বড় হবেন– এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর সারাংশ হল, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সূর্য হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর আলোয় আলোকিত পূর্ণাঙ্গিন পূর্ণিমার চাঁদ। এই উপমাটি তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। যদি এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে উপরোক্ত চারটি বক্তব্য আপত্তি নয় বরং যথার্থ মূল্যায়ন বলে সাব্যস্ত হয়। হযরত মুহাম্মদ(সা.) সার্বজনিন নবী এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন হয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তিনি বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্যই মান্যবর হয়ে এসেছেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্বে আর কোন নবী বা রসূল এমন সার্বজনিন ছিলেন না বরং তাঁরা সবাই নিজ নিজ সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ যুগের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর আধ্যাত্মিক কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুসারীদেরকেও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস** অর্থাৎ তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদেরকে মানবকল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলিম উম্মতের মর্যাদাগত অবস্থান বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারীদের শীর্ষে। কেন? কেননা আমরা শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ(সা.)-এর অনুসারী!

ঠিক তেমনি, হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর শিষ্যদের মাঝে যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা দান করেছেন তার মাঝে সর্বশীর্ষে রয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী(আ.)। হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর পর অনেক ওলী আউলিয়া বুযুর্গ গত হয়েছেন। এসব বুযুর্গদের মাঝে সর্বশীর্ষে অবস্থান লাভ করেছেন রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর আনুগত্যে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। আর একথার প্রমাণ পাওয়া যায় মুহাম্মদ(সা.)-এর বক্তব্য

থেকেই। তিনি(সা.) বলছেন, **আবু বাকরিন খাইরুন নাসি বা'দী ইল্লা আইয়াকুনা নাবিউন।** অর্থাৎ 'আমার পর কোন নবী না হলে আবু বকর(রা.) উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম' (তাবরানী মু'জামে কাবীর, কান্‌যুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড পৃ. ১৩৮; দেওবন্দের শিরমনি মুফতি মুহম্মদ শফী রচিত খতমে নবুয়্যত পুস্তকের ১০৩ নম্বর হাদীস দ্রষ্টব্য। বাংলায় অনুদিত খতমে নবুয়্যত পুস্তকের ৩৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, এই উম্মতে আবু বকর সর্বোত্তম তবে যদি কেউ নবীর মর্যাদা লাভ করে তাহলে তিনি এই উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হবেন। তাই রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর আনুগত্যে শেষযুগে আগমনকারী মহাপুরুষ যাকে নবীজি(সা.) একদিকে 'আল-মাহদী' অন্যদিকে 'নবীউল্লাহ ঈসা'বলেছেন– তিনিই উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি মুসলমানদের হারানো ঈমান ও ঐক্য ফিরিয়ে দিবেন। উম্মতের মাঝে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যাঁর হাতে বয়াত করার জন্য আমাদের প্রিয় রসূল(সা.) বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়ে হলেও পার হয়ে যেতে বলেছেন, যাঁকে সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ স্বয়ং মহানবী(সা.) দিয়েছেন– উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে তিনিই শ্রেষ্ঠ ।

উদ্ধৃত বাক্যে একথাও বলা হয়েছে, 'কেবল নবীই নয় বরং অনেক আত্মপ্রত্যয়ী নবীর মর্যাদা থেকেও বেড়ে গেছেন।' এ বিষয়টি বোঝার জন্য আলেম উলামাদের মর্যাদা বর্ণনায় হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর একটি হাদীস প্রথমে জেনে রাখা দরকার। আর তা হল, **উলামাউ উম্মাতী কা-আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল।** মহানবী(সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের আলেমরা বনী ইসরাইলের নবীদের সমতুল্য হবেন'। যেক্ষেত্রে সত্যিকার আলেম-উলামা বনী ইসরাঈলী জাতির নবীদের সমতুল্য, সেক্ষেত্রে যিনি এসকল আলেমদের নেতা হয়ে আসবেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই বনী ইসরাঈলী নবীদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর এতে মহানবী(সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়।

শেষযুগে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হবার দাবী করলেন তখন মুসলমান আলেম-ওলামা তাঁকে গ্রহণ না করে অনেকে উল্টো প্রশ্ন তুলেছেন, কেন তাঁকে মানতে হবে। তখন মহানবী(সা.)-এর আনুগত্যে শেষ যুগে আগমনকারী মহাপুরুষের মান ও মর্যাদার বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করেছেন। মির্যা সাহেব এক দাস বা গোলামের উচ্চ মর্যাদা অপরাপর

সকল ধর্মের সামনে তুলে ধরে মূল মালিক হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এরই মর্যাদা উন্নত করেছেন। এতে আপত্তির কিছুই নেই।

আপত্তিঃ দুনিয়াতে কোন নবী এমন আসেননি, যিনি ইজতেহাদী ভুলের শিকার হননি। (রূহানী খাযায়েন ২২/৫৭৩)

উত্তর : আল্লাহ্ তা'লা ইজতেহাদী ভুল করার ক্ষেত্র উন্মুক্ত রেখে 'উলুহিয়াত' ও 'বাশারিয়াতের' মাঝে সাতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা একমাত্র অস্তিত্ব যিনি 'আলেমুল গায়বি ওয়াশ্ শাহাদাহ'। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ, তিনি যতবড় নবীই হোন– এই অতুলনীয় গুণের অধিকারী হতে পারেন না। তাই তো আল্লাহ্ তালা হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর মুখ দিয়ে ঘোষণা করিয়েছেন,

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ ...আর আমি যদি অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি প্রচুর ধন-সম্পদ জড় করে নিতাম এবং আমাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শও করত না। ঈমান আনয়নকারী লোকদের জন্য আমি যে কেবল এক সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (সূরা আরাফ: ১৮৯) অতএব অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় তারা কোটি কোটি গুণ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা মানবীয় দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নন। এর উদাহরণ সবচেয়ে বড় নবীর জীবন থেকে উদ্ধৃত করে এসেছি (১২ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখুন)। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মাঝে প্রত্যেক মুসলমান এ কথারই ঘোষণা করে। একজন নবী যত বড় মর্যাদারই অধিকারী হন না কেন কেউই আমাদের উপাস্য নন– এ কথায় যেমন তাঁদের অবমাননা হয় না, তেমনি মানুষ রসূল হিসাবে তাদের মানবীয় সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাস করলে তাদের কোন অবমাননাও হয় না।

আপত্তিঃ আমার আগমনের দ্বারা প্রত্যেক নবী জীবন ফিরে পেয়েছে। আর সমস্ত রাসূল আমার জামার মধ্যে গোপন হয়ে আছে। (কবিতার অনুবাদ) (রূহানী খাযায়েন ১৮/৪৭৮)

উত্তর : মহানবী(সা.)-এর পূর্বে যত নবী রসূল এসেছেন তাদের সত্যতার সন্দেহাতীত প্রমাণ জগতের কাছে ছিল না। একমাত্র মহানবী(সা.) এসে সমস্ত

নবী রসূলের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন বলেই আজ তাঁরা সত্য নবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। নবীজি(সা.)-এর এই বিশেষ বৈশিষ্টের কারণে তিনি'খাতামান্নাবীঈন' অর্থাৎ নবীগণের সত্যায়নকারী। মহানবী(সা.)-এর তিরোধানের পর পুনরায় যখন পূর্ববর্তী নবীদের সম্মান ও মর্যাদা ম্লান হবার উপক্রম হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্কে পাঠিয়ে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেযার ব্যবস্থা করেন। তাদের চরিত্রে যেসব কালিমা লেপনের চেষ্টা করা হয় হযরত মির্যা সাহেব সেসব কালিমা অপসারণ করে তাদেরকে পবিত্র সাব্যস্ত করেছেন। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ইলহাম করে বলেছেন, তাঁকে 'জারিউল্লাহে ফী হুলালিল আম্বিয়া' আখ্যা দিয়েছেন। মহানবী(সা.)-এর অতুলনীয় সাফল্য ও অবস্থান তুলে ধরে হযরত মির্যা সাহেব বলেছেন,

'সেই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে সম্পূর্ণ এবং পূর্ণ মানব ছিলেন এবং পূর্ণ নবী ছিলেন এবং যিনি পূর্ণ কল্যাণরাজি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান ও একত্রিকরণের কারণে পৃথিবীর প্রথম কিয়ামত (পুনরুত্থান) সংঘটিত হয়, যাঁর আগমনে এক মৃত জগৎ জীবন ফিরে পায় সেই মোবারক নবী হলেন হযরত খাতামুল আম্বিয়া, ইমামুল আসফিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীগণের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। হে প্রিয় খোদা! এ প্রিয় নবীর প্রতি এমন রহমত ও দরূদ বর্ষণ কর যেমনটি দুনিয়া সৃষ্টি অবধি তুমি কারও প্রতি নাযেল কর নি। এ অসীম মর্যাদাবান নবী পৃথিবীতে আবির্ভূত না হলে ছোট ছোট যত নবী দুনিয়ায় এসেছেন, যেমন ইউনুস, আইয়ুব, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, মালাখি, ইয়াহ্ইয়া, যাকারিয়া প্রমুখ তাঁদের সত্যতার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে থাকত না, যদিও তারা সবাই নৈকট্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত এবং খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন ছিলেন। এ কেবল মহানবী(সা.)-এরই অনুগ্রহ বিশেষ যার ফলে এ নবীগণও পৃথিবীতে সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। হে আল্লাহ্! তাঁর(সা.), তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ সবার প্রতি তুমি দরূদ, রহমত ও বরকত নাযেল কর" (ইতমামুল হুজ্জত, পৃষ্ঠা ২৮)।

আপত্তিঃ যদি মূসা ও ঈসা আ. হত তাহলে মসীহের (মির্যা সাহেবের) আনুগত্য তাদের অবশ্যই করতে হত। (আল ফযল, ১৮-৩-১৯১৬ কাদিয়ান)

উল্লেখ্য, মির্যা সাহেব উল্লেখ করেছেন যদি মূসা ও ঈসা জীবিত হত... (রূহানী খাযায়েন ১৪/২৭৩) তিনি এখানে ঈসাকে মৃত প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্য হাদীসের মধ্যে ঈসা আ. -এর নাম বৃদ্ধি করেছেন। অথচ নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে তা নেই। প্রমাণ স্বরূপ দেখুন : (মুসনাদে আহমাদ, মাসানিদে জাবির রা. মিশকাত পৃষ্ঠাঃ ৩০ ভারতীয় কপি)

উত্তরঃ 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ! ঈসা(আ.)-কে মৃত প্রমাণ করার জন্য হাদীসের মধ্যে ঈসার নাম বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনের ত্রিশটি আয়াত দিয়ে হযরত ঈসা(আ.)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত। যেমন-

আল্লাহ তালা এদিক থেকেও তার মৃত্যুর ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। বলছেন-

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللہِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّہُمْ يُخْلَقُوْنَ 0 اَمْوٰتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ

অর্থাৎ আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা সবাই মৃত, জীবিত নয়। (সূরা নহল- ২১, ২২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয় তারা সবাই মৃত। প্রশ্ন হলো, ঈসা (আ.)-এর উপাসনা হয় কি না? কেউ তাঁর উপাসনা করে কি না? উত্তর হবে, হ্যাঁ করে। এটা সবারই জানা, খৃষ্টানরা তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করে। তাই এই আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী খৃষ্টানদের উপাস্য **ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বর** যিশু অর্থাৎ হযরত ঈসা(আ.) মৃত, জীবিত নেই। এমন আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন।

বাকী রইল, 'আল্লামা' বলছেন, মির্যা সাহেব হাদীসে এই নামটি জালিয়াতী করে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। দেখুন, তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, হাদীসে আছে যদি মুসা ও ঈসা জীবিত থাকত তাহলে তাদের উভয়ের আমার অবশ্যই আনুগত্য করতে হত। এছাড়া সৈয়দ কুতুব শহীদের তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নম্বর আয়াতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, কয়েকটি হাদীসে রয়েছে যদি

মুসা ও ঈসা জীবিত থাকত তাহলে তাদের উভয়ের আমার অবশ্যই আনুগত্য করতে হত।[১৭]

অতএব 'আল্লামা' কোন বিষয়ে জ্ঞান না রেখে আপত্তি বা অপবাদ আরোপ করলে এভাবেই লজ্জিত হতে হয়।

আপত্তিঃ কুরআনকে আমি কাদিয়ানের কাছে অবতীর্ণ করেছি। মির্যা সাহেবের কাছে ওহী। *(তাযকেরাহ ৫৯, ৪র্থ এডিসন)*

উত্তরঃ চলুন এ বিষয়ে হযরত সাহেবের সম্পূর্ণ ইলহামটি দেখে নেয়া যাক। ইলহামটি হল, **"ইন্না আনযালনাহু কারীবান মিনাল কাদিয়ান। ওয়া বিলহাক্কি আনযালনাহু ওয়া বিল-হাক্কি নাযালা। সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু ওয়া কানা আমরুল্লাহি মাফউলা।"***(তাযকেরাহ ৫৯, দ্র. ৪র্থ এডিসন)*

এই ইলহামটির ঠিক নিচে মির্যা সাহেবকৃত অর্থ এভাবে দেয়া আছেঃ "আমি এসব লক্ষণাবলী ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীকে এবং এই তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ ইলহাম কাদিয়ানের নিকটে অবতীর্ণ করেছি। আর যথার্থ প্রয়োজনে অবতীর্ণ করেছি এবং প্রয়োজন সাপেক্ষেই অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন যা পূর্ণ হয়েছে আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা পোষণ করেছেন তা পূর্ণ হবারই কথা।" (তাযকেরাহ্, ৪র্থ এ্যাডিশন পৃষ্ঠা ৫৯)

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন, আরবী ইলহামটিতে কুরআন অবতীর্ণ করার কথা বলাই হয় নি। 'কুরআন' শব্দটিই এতে নেই। তা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের শত্রুতা মানুষকে কতটা অন্ধ করে দিয়েছে। 'আল্লামা' নিজেও ভাল করে জানেন, হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয় নি। বরং শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কাছে কুরআনের মাঝে নিহিত ঐশীজ্ঞান ও মারেফাত অবতীর্ণ করার কথা এতে বলা হয়েছে। মির্যা সাহেব নিজে এ ইলহামের অনুবাদ করে দিয়েছেন (উদ্ধৃত মূল পৃষ্ঠাটি ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। একজন আরবী-উর্দূ জানা 'আল্লামা' কেমন করে এত প্রাঞ্জল মিথ্যা বানিয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন– এটি ভাবতেও অবাক লাগে! সাধারণ বাঙালি মুসলমান আরবী উর্দূ জানে না বলে তাদেরকে এত বোকা মনে করার কোন কারণ নেই। পাঠকবৃন্দ, শুধু মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয় তাই আমরা 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের

এসব আপত্তির উত্তর লিখছি নইলে যার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রতারণা সাব্যস্ত হয়ে যায় তাকে উত্তর দেয়ার কোন নৈতিক দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ওপর বর্তায় না।

হযরত মির্যা সাহেব উক্ত ইলহামের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে শেষযুগের মহাপুরুষ দামেস্কের পূর্বাঞ্চলে শুভ্র মিনারার নিকটে আবির্ভূত হবেন। উক্ত ইলহামে ইনদা কাদিয়ান বলে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে পূর্বাঞ্চলের সেই স্থান হল কাদিয়ান। অর্থাৎ যে স্থান থেকে প্রকৃত ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। (এই ইলহামের ব্যাখ্যা দেখার জন্য দেখুন ইযালায়ে আওহাম পৃষ্ঠা ৭৩)

যেহেতু মির্যা সাহেবের এ ইলহামে পবিত্র কুরআনের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ নেই তাই ইলহামটিকে কুরআন অবমাননাকর বলার কোন সুযোগই নেই।

আপত্তিঃ কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব ও আমার মুখের কথা। *(তাযকেরাহ ৭৭, দ্র. ৪র্থ এডিসন)*

উত্তর : এ ইলহামটি সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ(আ.)কে জিজ্ঞেস করা হল, হযূর এই যে ইলহাম হল- কুরআন আল্লাহর কিতাব আর আমার মুখের বাণী- এখানে 'আমার' সর্বনামটি কার জন্য প্রযোজ্য অর্থাৎ কার মুখের কথা? তিনি(আ.) বললেন, আল্লাহ্‌র মুখের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, আমার মুখের কথা। এধরনের সর্বনামের পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। (বদর পত্রিকা, খণ্ড ৬ নম্বর ২৮ ১১ জুলাই ১৯০৭ পৃষ্ঠা ৬)

অতএব যেখানে মির্যা সাহেব নিজে বলে গেছেন এই ইলহামে 'আমার' সর্বনামটি আল্লাহর দিকে আরোপিত তাই আপত্তির কোন সুযোগই নেই। 'আল্লামা'কে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য 'ইলতিফাতে যামায়ের' বা সর্বনাম পদ পরিবর্তন এর উদাহরণ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট পাওয়া যায়। তাহলে কি পবিত্র কুরআন পড়ে আলেম হন নি? কেননা দেখুন কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,

সূরা ফাতেহা আমাদের সবারই জানা। সূরা ফাতেহার সূচনাতে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক প্রভু। তিনি রহমান, রহীম এবং মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। এখানে যিনি, তিনি, সব সর্বনাম আল্লাহ্‌র দিকে আরোপিত। এরপরে আয়াতে হঠাৎ বলা হল, আমরা তোমারই ইবাদত করি, আর তোমারই কাছে সাহায্য চাই। প্রথম কয়েকটি আয়াত ছিল, গায়েবের সর্বনাম তথা নাম পুরুষ। এরপর হঠাৎ হয়ে গেল মধ্যম পুরুষ বা মুখাতাব-এর সিগা বা সর্বনাম।

আবার দেখুন, সূরা লুকমানের **১১** নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

অর্থ: তিনি আকাশমণ্ডলিকে সৃষ্টি করেছেন কোন খুঁটি ব্যতিত তোমরা তা দেখছ। আর পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যেন এটি তোমাদের নিয়ে পড়ে। আর এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার প্রাণি। আর আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এরপর এর দ্বারা আমি এতে সব ধরনের উদ্ভিদ উদগত করেছি।

পাঠক লক্ষ্য করুন, আয়াত শুরু হচ্ছে 'তিনি' দিয়ে কিন্তু এরপরই শুরু হয়ে গেল 'আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি'। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ কি তাহলে এতে আপত্তি করবেন, আল্লাহ্ আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, সকল প্রাণি তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আর মুহাম্মদ(সা.) বলছেন, আমি বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এমন সংশয় প্রকাশ বা বক্র অর্থ খোদাভীরু কোন আলেম করতেই পারেন না।

'আল্লামা' তো আর অল্পবিদ্যার আলেম নন তিনি তো আরবী উর্দূ জানা মাদ্রাসা পাশ আলেম। 'আল্লামা' নিশ্চয় ইলতেফাতে যামায়েরের বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। প্রশ্ন জাগে এতসব জানা সত্ত্বেও তিনি কেন এই অযৌক্তিক আপত্তিটি উত্থাপন করলেন।

আপত্তি: হযরত মির্যা সাহেব বলেছেন "অথবা স্বীকার করতেই হবে যে কুরআন শরিফ অশ্লিল গালি দিয়ে ভর্তি এবং কুরআন কঠোর ভাষার রাস্তা ব্যবহার করেছে। (রুহানী খাযায়েন, ৩/১২৫)

উত্তর: যারা পবিত্র ইসলাম, কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে একচেটিয়াভাবে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে হযরত মির্যা সাহেব কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। ইসলাম, কুরআন এবং মহানবী(সা.)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেবের কঠোর অবস্থান নিয়ে আপত্তি করা হয়, কেন মির্যা সাহেব কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন? এই আপত্তি খণ্ডন করে হযরত মির্যা সাহেব দীর্ঘ উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে খণ্ডিত ও বিকৃত ভাবানুবাদ উপস্থাপন করে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পায়তারা করছেন। অন্যকে মিছামিছি খুশি

করার জন্য সত্য গোপন করাকে বাংলাতে বলা হয় চাটুকারিতা আর আরবীতে বলা হয় মুদাহানাত।

কুরআন শরিফ এই ধরনের চাটুকারিতার ঘোর বিরোধী। সূরা কালামে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

অর্থাৎ 'আর তুমি মিথ্যাবাদীদের অনুসরণ করো না, তারা চায় তুমি নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে' (সূরা কলম: ৯-১০)। হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের স্বপক্ষে কলমযুদ্ধে নেমেছিলেন এবং খোদা-প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য এ কাজ করছেন। কুরআন শরিফ ভদ্রতা এবং শালীনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সত্য কথা কখনও গোপন করে নি। নির্ভিকভাবে সত্য উপস্থাপন করেছে। এ কথা উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি(আ.) কুরআন থেকে একের পর এক উদাহরণ দিয়েছেন। আমার পক্ষ থেকে সত্য কথা নির্বিঘ্নে বলা যদি অশালীনতা এবং গালি হয়ে থাকে তাহলে কুরআন শরিফের বিরুদ্ধেও এই একই অভিযোগ বর্তাবে। কিন্তু মির্যা সাহেব বলেছেন, গালিগালাজ এক জিনিষ এবং সত্যের অকপট বর্হিপ্রকাশ ভিন্ন জিনিষ। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, খ্রিষ্টান এবং আর্যসমাজী পুরোহিত ও পাদ্রীরা ইসলামের বিপক্ষে যেসব কুরুচীপূর্ণ কথা এবং অশ্লিল কথা বলেছে তার সদুত্তর দিয়ে মির্যা সাহেব কি সঠিক কাজ করেছেন নাকি বেঠিক কাজ করেছেন? যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল এবং তাঁর কুরআন এর বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে তাদেরকে কী ধরনের উত্তর দিলে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ খুশি হবেন। আজ ১২৭ বছর পর মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আপত্তি করা সহজ, কিন্তু তিনি যে অন্ধকার যুগে ইসলামের আলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করেছেন তখন তাঁকে সঙ্গ দেয়ার মত কেউ ছিল না। কলমের যুদ্ধে একা তিনি বাজিমাত করে গেছেন। আপত্তিকারীকে ভদ্রতা এবং শালীনতার মনগড়া মানদণ্ড খণ্ডন করার জন্য হযরত মির্যা সাহেব কুরআনের কঠোর ভাষার উত্তরগুলো তুলে ধরে তার অভিযোগের অপনোদন করেছেন। কুরআনকে অবমাননা করার জন্য করা হয়নি। বরং মুসলমানদের ঈমানী আত্মাভিমান জাগ্রত করার জন্য কুরআন থেকে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

.. ..وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ

বলা হয়েছে, 'তোমরা কিতাবধারীদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় ধর্মীয় বিতন্ডা করবে তবে তাদের মাঝ থেকে যারা অন্যায় করেছে তাদের বিষয়টি ভিন্ন'...(সূরা আনকাবুত: ৪৭)। তবে তাদের মাঝ থেকে যারা অন্যায় করেছে হযরত মির্যা সাহেব কুরআনের এই স্বর্ণশিক্ষা অনুযায়ী কেবল তাদের সীমালঙ্ঘনের পর তাদেরকে কড়া ভাষায় জবাব দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে সে কি কুরআন অবমাননা করে? মির্যা সাহেব কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র।

আপত্তিঃ হযরত মির্যা সাহেব তার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি সেভাবে ঈমান রাখেন যেভাবে তিনি কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন।

উত্তর: এতে আপত্তি কীসের? যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী(সা.)-এর অনুসরণের কল্যাণে নিজের পক্ষ থেকে ইলহামে ভূষিত করেন এবং সেই সত্য ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আরশের খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম লাভ করে থাকেন তাহলে সেই ইলহামের প্রতিও তাঁকে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে যেভাবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হয়। কেননা উভয়ের উৎসমূল এক ও অভিন্ন।

৫) কুরআন অবমাননার উদাহরণ দিতে গিয়ে আলোচ্য পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় যে পঞ্চম আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে সেটি মির্যা সাহেবের বক্তব্যই নয়, তার স্থলাভিষিক্ত কোন খলিফারও বক্তব্য নয়। এর উত্তর দিতে আমরা বাধ্য নই। তবে হ্যাঁ, কুরআন উঠে যাওয়া সম্পর্কে মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবুল ইলমে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কীভাবে ঈমান উঠে যাবে সে সম্পর্কে বুখারী কিতাবুত তাফসীরে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আর মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. সাহেব তার বক্তব্যে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন আল্লাহ্ তা'লা সেই অবক্ষয়প্রাপ্ত যুগে চিকিৎসক হিসেবে হযরত মির্যা সাহেবকে পাঠিয়েছেন। হাদীস দু'টি পরবর্তী আপত্তির উত্তরে দেয়া হয়েছে দেখে নিন।

আপত্তিঃ হযরত মির্যা সাহেব লিখেছেন, কুরআন ধরাপৃষ্ঠ থেকে উঠে গিয়েছিল। আমি হাদীসের বক্তব্যনুযায়ী তা ঊর্ধ্বোলোক থেকে নিয়ে এসেছি। (রুহানী খাযায়েন ৩/ ৪৯৩)

উত্তর: হযরত মির্যা সাহেব যেহেতু এস্থলে হাদীসের বরাতে কথা বলেছেন তাই এ বিষয়ে কেবল দু'টি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। 'মিশকাতুল মাসাবী'র কিতাবুল ইলমের একটি হাদীস এখানে উল্লেখ করলেই হযরত মির্যা সাহেবের বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে। হাদীসটি নিম্নরূপ-

মিশকাত শরীফের হাদীস:

أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের কেবল নাম এবং কুরআনের শুধু অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আরম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মাঝে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মাঝ থেকে নৈরাজ্য মাথাচাড়াদিবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।" *(বায়হাকী, মিশকাত)।*

এখানে স্পষ্টভাবে হুযূর(সা.) বলেছেন, এক যুগ আসছে যখন ইসলামের কেবল নাম অবশিষ্ট থাকবে, এর প্রকৃত মর্ম ও শিক্ষা অবশিষ্ট থাকবে না। দ্বিতীয়ত: ধরাপৃষ্ঠ থেকে কুরআনের মর্ম ও প্রকৃত শিক্ষা উবে যাবে অবশিষ্ট থাকবে কেবল এর অক্ষরগুলো অর্থাৎ এর উচ্চারণ নিয়ে মানুষ ব্যতিব্যস্ত থাকবে। মসজিদগুলো সুরম্য অট্টালিকা হবে এবং বাহ্যত জনাকীর্ণও হবে কিন্তু সেগুলো হবে হেদায়াতশূণ্য। তখন অনেক 'আলেম' থাকবে, কিন্তু তারা হবে মানুষের বানানো এবং মানুষের স্বীকৃত উলামা। মহানবী(সা.) এ হাদীসে বলেছেন, আকাশের চামড়ার তলে তারা হবে নিকৃষ্টতম জীব। তাদের প্রধানতম লক্ষণ হবে, তাদের কাছ থেকে নৈরাজ্য ছড়াবে এবং তাদের মাঝেই তা ফিরে যাবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়, শেষযুগে তথাকথিত আলেমদের কাছে ইসলাম থাকলেও তা হবে কেবল পুঁথিগত ও প্রথাগত একটি বিষয়। আর পবিত্র কুরআনের অক্ষরগুলো ঠিক থাকলেও এর তত্ত্ব ও মর্ম মানুষ উপলব্ধি করবে না।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) যে যুগে আগমন করেছিলেন এই হাদীসটি হুবহু সেই যুগের চিত্রায়ন করছে। সে যুগের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক সবাই একথা অকপটে স্বীকার করেছেন। আর আজকের যুগের কথা বললে তো এ বিষয়ে কারও দ্বিমতই থাকতে পারে না। **কুরআন উঠে যাবে** বলতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'আর হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী তা আমি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছি'– এই বক্তব্যের অর্থ হল, মির্যা সাহেব শেষযুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ হয়ে সেই হারানো ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। এটিই শেষ যুগের প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের জন্য নির্ধারিত কাজ ছিল। নিচের হাদীসটি পড়লে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ { وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ } قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

অনুবাদঃ আবূ হুরায়রা(রা.) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন- আমরা নবী (সা.)-এর কাছে বসেছিলাম। এ অবস্থায় তাঁর প্রতি নাযিল হল সূরা জুমুআ, যার একটি আয়াত হল- وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ অর্থ "এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত অন্য আরেক দলের মাঝেও যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি" (সূরা জুমুআ, আয়াত ০৪)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা (যাদের মাঝে আপনার আসার কথা)? তিনবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও তিনি কোন উত্তর দিলেন না। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহর রসূল সালমান(রা.)-এর ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের চলে গেলেও এদের এক বা একাধিক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। *(বুখারী: কিতাবুত তাফসীর)*

হযরত মির্যা সাহেব পারস্য বংশদ্ভূত সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হবার দাবিদার। তিনি এ জগত থেকে বিলুপ্ত ঈমানকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এসেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খলীফাগণও সেই কাজই অব্যাহত রেখেছেন। অতএব হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী তদনুযায়ী তিনি ঈমানকে এবং কুরআনের হারানো জ্ঞানকে উদ্ধার করে গেছেন।

আপত্তি করতে লাইসেন্স লাগে না। কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটাই। আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ(সা.) যা বলেছেন মির্যা সাহেব যদি তদনুযায়ীই কথা বলে থাকেন তাহলে এ বিষয়ে আর কোন কথাই থাকতে পারে না। হযরত মির্যা সাহেব বলছেন, কুরআনের শিক্ষা উঠে গেছে। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের আপত্তি হল, একথা কীভাবে মির্যা সাহেব বলতে পারেন, আমাদের কুরআন তো উঠে যায় নি। মহানবী(সা.) হাদীসে যে বলেছেন, পবিত্র কুরআন শুধু অক্ষরে থাকবে এর মর্ম থাকবে না। আর বুখারী শরীফের হাদীসে যে মহানবী(সা.) বলেছেন ঈমান উঠে যাবে - মির্যা সাহেব শুধু মহানবী(সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত সেই যুগকে চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন। এটি কুরআন বা ইসলামের অবমাননা নয় বরং এটি মহানবী(সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা যা এক শ্রেণীর আলেম-উলামা হীন স্বার্থ চরিতার্থে মানতে চান না।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেবের একটি ইলহাম- "মা আনা ইল্লা কাল্ কুরআনে ওয়া সা-ইয়ায্হারু আলা ইয়াদাইয়া মা যাহারা মিনাল ফুরকান।" আমি তো কেবল কুরআনের মত এবং অচিরেই আমার মাধ্যমে আমার হাতে সে সব বিষয় প্রকাশিত হবে যা কুরআন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরঃ এ বক্তব্যের বাক্যগুলো পূর্ণাঙ্গিনভাবে তুলে না ধরে উল্টো খণ্ডিত অংশ তুলে ধরে 'আল্লামা' বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। ইলহামের মাঝেই এর অর্থ ও মর্ম উল্লিখিত রয়েছে। আর তা হল, আমার মাধ্যমে তা-ই প্রকাশিত হবে যা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

হযরত মির্যা সাহেবের সারাটা জীবন কুরআনের তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য উন্মোচনে নিবেদিত ছিল। তিনি কুরআনের যুক্তি ও শিক্ষা উপস্থাপন করে মিথ্যাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন দ্বারা যা সাব্যস্ত সেটাকে গ্রহণ কর আর যা কুরআন বিরোধী বা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তা বর্জন কর। একেই বলে কুরআনের প্রকাশ যা মির্যা সাহেবের মাধ্যমে ঘটেছে।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব তার উপর নাযিল হওয়া ওহীর সমষ্টিকে নাম দিয়েছে 'তাযকেরাহ'। অথচ তা কুরআনেরই একটি নাম।

উত্তরঃ 'আল্লামা'র জানা উচিত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর ওহীর কোন সংকলন প্রকাশিত হয়নি। অতএব এর নাম 'তাযকিরা' তিনি কীভাবে রাখবেন? 'আল্লামা' দেখছি মিথ্যা বলাকে জায়েযই বানিয়ে ফেলেছেন।

হযরত মির্যা সাহেবের মৃত্যুর অনেক বছর পর তাঁর রচিত বিভিন্ন পুস্তকে এবং প্রকাশিত বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে যেসব ওহী ও ইলহাম ছাপা হয়েছিল সেগুলোকে সংকলন আকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কোন ধর্ম বিধানের বই নয় বরং শেষ ও সম্পূর্ণ শরীয়ত আল কুরআনের শিক্ষাকে মহানবী(সা.)-এর অনুকরণে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করার পুরস্কার। শরীয়তের শিক্ষা ও বিধান চূড়ান্ত ও শেষ হয়েছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই (সূরা মায়েদা : ৪)। এর আত্মিক শিক্ষা পালন করলে এবং মহানবী(সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ করলে আল্লাহর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। মির্যা সাহেবের প্রতি অবতীর্ণ ওহী-ইলহাম ইসলামের আধ্যাত্মিক বাগানের সুমিষ্ট ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী ও ইলহামের সংকলনের নাম 'তাযকিরা' রাখায় আপত্তি থাকলে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, ইমাম কুরতুবীর লেখার সংকলনের নামও 'তাযকিরাহ'। এ বিষয়ে তার কোন আপত্তি আমরা শুনি নি কেন? 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' নামক পুস্তকের বিষয়ে তার আপত্তি নেই কেন? অতএব এ আপত্তি কোনমতেই ধোপে টেকে না।

আপত্তিঃ **তাফসীরের কারণে কুরআনে যে ভুলগুলো সংঘটিত হয়েছে আমি তা চিহ্নিত করতে এসেছি।** এক আত্মভোলার কাশফ। (রুহানী খাযায়েন ৩/৪৮২)

উত্তরঃ সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হল, যে উদ্ধৃতি তিনি আপত্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন তা মির্যা সাহেবের বক্তব্যই নয়। সাধারণ মানুষ উর্দূ আরবী পড়তে জানে না দেখে একজন 'আল্লামা' এভাবে বিভ্রান্তি ছড়াবেন এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। উক্ত পৃষ্ঠায় খোদাপ্রেমে আসক্ত এক'মাজযূব' ব্যক্তি জামালপুর নিবাসী জনৈক গোলাবশাহ হযরত মির্যা সাহেবের আবির্ভাবের ৩০ বছর পূর্বে তাঁর

আগমন সম্বন্ধে আগাম বর্ণনা বা বিবৃতি যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন। করিম বখশ নামে এক ব্যক্তি তাঁর জীবন সায়াহ্নে এসে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে লিখিত আকারে গোলাব শাহ নামক খোদাভক্ত 'মাজযূব'-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি সাক্ষীদের সামনে লিখিত আকারে জমা দেয়ার পর হযরত মির্যা সাহেব ১৮৯১ সালে তাঁর লিখিত সাক্ষ্যটি 'ইযালায়ে আওহাম' গ্রন্থে ছাপিয়ে দেন। খোদাভক্ত গোলাপ শাহ্‌র বক্তব্যটি করিম বখশের বর্ণনায় নিম্নরূপঃ

ঈসা এখন যুবক বয়সে উপনীত হয়েছেন এবং তিনি লুধিয়ানায় এসে কুরআনের ভুল বের করবেন এবং কুরআনের মানদণ্ডে সিদ্ধান্ত দিবেন।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'মৌলভীরা তাকে অস্বীকার করবে।' 'তখন আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, কুরআন তো আল্লাহর বাণী, কুরআনেও কি ভুল-ভ্রান্তি আছে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তফসীরের উপর তফসীর হয়ে গেছে এবং কবির ভাষা ছড়িয়ে গেছে। এরপর বললেন, ঈসা যখন আসবেন তখন তিনি কুরআন থেকে ফয়সালা করবেন। আর মৌলভীরা তা অস্বীকার করবে। আর যখন সেই ঈসা লুধিয়ানায় আসবেন তখন ব্যাপক প্লেগের পাদুর্ভাব ঘটবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ঈসা এখন কোথায়?' তিনি বললেন, 'কাদিয়ানে'। আমি বললাম, 'কাদিয়ান তো লুধিয়ানার মাত্র তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত– সেখানে আবার ঈসা কোথায়?' তিনি এর উত্তর দিলেন না। আমি তখন জানতাম না গুরুদাসপুর জেলাতে কাদিয়ান নামে একটি গ্রাম আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঈসা ইবনে মরিয়ম নবিউল্লাহ্‌ তো আকাশে আছেন এবং মক্কায় অবতরণ করবেন।' তিনি উত্তরে বললেন, 'ঈসা ইবনে মরিয়ম নবিউল্লাহ মারা গেছেন। এখন তিনি আসবেন না। আমরা বাদশাহ্‌, মিথ্যা বলব না'।"

উক্ত বর্ণনায় জানা যায়, গোলাব শাহ মাজযূব বলেছেন, আগমনকারী ঈসা এসে মুসলমান ওলামাদের মাঝে প্রচলিত ভুল ধ্যান-ধারণা কুরআন শরীফ থেকে খণ্ডন করবেন। গোলাব শাহ্‌ সাহেবের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর তিন স্থানে এই কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সে কথা উল্লেখ না করে উক্ত ব্যক্তির খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ বর্ণনাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং বিকৃত বক্তব্যটিকে আবার মির্যা সাহেবের প্রতি আরোপও করেছেন! হে 'আল্লামা'! আমরা আবার বলছি, কুরআনকে সংশোধন করার জন্য নয় আলেম-উলামাদের মাঝে প্রচলিত ভুল ধ্যানধারণাকে কুরআন দ্বারা খণ্ডন করার কথা উক্ত ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্ট করে বলা

হয়েছে। আমাদের ধারণা ছিল, আপনি হযরত মসীহে মাওউদ(আ.)-এর বইগুলো পড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছেন। আপনার এ আপত্তিটি পড়ে মনে হচ্ছে, আপনি তার লেখাটি পড়েও দেখেন নি। আপনি অন্যদের চর্বিত চর্বণ উপস্থাপন করেছেন মাত্র।

আপত্তিঃ সমর্থনের জন্য আমরা ঐ সকল হাদীসও উল্লেখ করি যা কুরআন মুতাবিক হয় এবং আমার ওহীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এছাড়া অন্য হাদীসকে ডাষ্টবিনের ময়লার মত নিক্ষেপ করি। *(রূহানী খাযায়েন ১৯/১৪০)*

উত্তরঃ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কৃত ওহী কোন মানুষের প্রতি অবতীর্ণ হোক কিংবা কুরআনের আয়াত আকারে সংরক্ষিত হোক এ দু'য়ের মাঝে বিশুদ্ধতার দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উভয় একই উৎস থেকে উৎসারিত। মহানবী(সা.)-এর প্রতি আরোপিত হাদীস শত শত বছর পর সংকলিত হয়। ন্যূনতম কয়েক দশক পর এগুলো জড় করা হয়েছিল। এগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি হল, কুরআনের মানদণ্ডে এসব যাচাই করা। **'মা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন্ হুওয়া ইল্লা ওয়াহইউন ইউহা'** অর্থাৎ রসূল(সা.)-এর কথা তা-ই হবে যা কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ। এ দু'য়ের মাঝে কোন স্ববিরোধ থাকতে পারে না। হযরত মির্যা সাহেব ঐশী ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে উপরোক্ত আয়াতের আলোকেআল কুরআনকে হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার বাণী সব ধরনের সন্দেহ ও মিশ্রণের কলুষমুক্ত। 'আল্লামা' নিশ্চয় আল্লাহ্‌কে মানুষের চেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী বলে মনে করেন। যদি তা-ই হয় সেক্ষেত্রে ওহী ও ইলহামপ্রাপ্ত এক ব্যক্তির উপরোক্ত কথাটি তার না বোঝার কথা নয়।

আরেকভাবে বিষয়টি চিন্তা করে দেখা যায়। মুসলমানদের মাঝে যেসব ফিরকা বিদ্যমান তারা বেশিরভাগই হাদীসের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে পৃথক হয়েছে। এতে বোঝা যায় গোড়া থেকেই হাদীসের বিষয়ে দ্বিমত আছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কিতাব আল-কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। আহ্‌মদীয়া জামা'তের বক্তব্য এ বিষয়ে একেবারে স্পষ্ট। আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী আল-কুরআন ধর্মজগতের সর্বোচ্চ আদালত। তদনুযায়ী হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা নিরূপন করতে হবে। মির্যা সাহেব হাদীস গ্রহণের বিষয়ে বলেন,

“হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফেকাহ্ সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। এছাড়া হাদীসের বড় উপকারিতা হল, এটি কুরআন ও সুন্নতের সেবক। ...পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং সুন্নত হল রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর কার্যপদ্ধতি, আর হাদীস হচ্ছে সুন্নতের সমর্থক সাক্ষী। হাদীসকে কুরআনের বিচারক মনে করা ভুল। কুরআনের বিচারক কুরআন নিজেই। ... তোমরা নবী করীম(সা.)-এর হাদীস এমনভাবে অবলম্বন কর যাতে তোমাদের গতি, স্থিতি, কর্মসম্পাদন বা কর্ম-বিরতি কিছুই যেন হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়। কিন্তু কোন হাদীস যদি পবিত্র কুরআন বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয় তবে তার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা কর। হয়ত এরূপ ‘অসংগতি’ তোমাদেরই বোঝার ভুলে সৃষ্ট। কোনভাবেই এই অসংগতিযদি দূরীভূত না হয় তাহলে এরূপ হাদীস বর্জন কর, কারণ তা রসূলুল্লাহ(সা.)-এর পক্ষ থেকে নয়। পক্ষান্তরে যদি কোন হাদীস ‘যয়ীফ’ তথা দুর্বল হয় অথচ কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে সেই হাদীসকে গ্রহণ কর, কারণ কুরআন এর সত্যায়ণ করছে (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৬২, ৬৩)।

এখানে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করার পন্থা হযরত মির্যা সাহেব আমাদের বলে দিয়েছেন। আর তা হল, পবিত্র কুরআনের সাথে তা সংগতিপূর্ণ হতে হবে। অথবা আল্লাহ্ তা'লা নিজে যদি কোন হাদীসকে সত্য বলে সাব্যস্ত করেন সেই হাদীস সত্য বলে বিবেচিত হবে। সামঞ্জস্য বের করার চেষ্টা সত্ত্বেও যে হাদীস আল্লাহ্ তা'লার ওহী বা কুরআন প্রদত্ত আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে থাকবে সেটা যে বর্জনীয় একজন মুসলমান তা কীভাবে অস্বীকার করতে পারে!

‘আল্লামা’! আপনি জানেন, ‘রাফা ইয়াদাইন’-এর হাদীস পড়া সত্ত্বেও দেওবন্দী আলেমরা তা আমলে নেন না, অথচ ‘আহলে হাদীস সম্প্রদায়’ সেই হাদীসকে আমলযোগ্য বলে গ্রহণ করছে। অর্থাৎ হাদীস যাচাই-বাছাই, গ্রহণ-বর্জন করার অধিকার আপনাদের সবার আছে। আশ্চর্যের বিষয়, আলেম-উলামা হাদীস যাচাই-বাছাই করার অধিকার রাখে অথচ আল্লাহ্র প্রেরিত ইমাম মাহদী ও মসীহর হাদীস যাচাই-বাছাই করার অধিকার নাই! **আ লাইসা ফীকুম রাজুলুন রাশীদ?**

আপত্তিঃ সত্য কথা হল, ফাতিমার বংশ থেকে কোন মাহদী আসবে না। এ সকল হাদীস জাল ভিত্তিহীন, বানানো। যা আব্বাসীয়দের শাসনামলে বানানো হয়েছে *(রূহানী খাযায়েন ১৪/১৯৩)*

উত্তরঃ হযরত মির্যা সাহেব কখনই ইসলামের মূল উৎসগুলোকে অস্বীকার করেন নি বরং আমাদেরকে মূল উৎসগুলোর অনুসরণ করে পথনির্দেশনা লাভ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

বিশেষ করে হাদীসের ব্যাপারে তিনি বলেছেন হাদীস কুরআন সুন্নতের সেবক তবে যদি সেগুলো কুরআন ও সুন্নত বিরোধী হয় তাহলে সাধ্যমত 'তাত্‌বীক' তথা সামঞ্জস্য উদ্‌ঘাটন করে তা গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেও যদি তা গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কুরআন ও রসূলের সুন্নতকে প্রাধান্য দিয়ে এমন হাদীসকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন। এসব বিষয়ে বিরোধ নিরসনের মানদণ্ড হল আল-কুরআন।

ফাতেমার বংশধর থেকে ইমাম মাহদীর আগমনের বিষয়টি কুরআন দ্বারাও সাব্যস্ত হয় না। বরং এর উল্টো সাব্যস্ত হয়। বলা হয়েছে আগমনকারী মহাপুরুষ আরবদের বাইরে অন্য আরেক জাতির মাঝে ঈমানশূন্য যুগে আগমন করবেন। সূরা জুমুআায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

বুখারী শরীফ কিতাবুত তাফসীরে উল্লেখ আছে মহানবী(সা.) হযরত সালমান ফারসী(রা.)-এর ওপর হাত রেখে বলেছেন, ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায় এদের অর্থাৎ পারস্য বংশের এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই ঈমানকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন। এই হাদীস থেকে জানা যায়, শেষ যুগে মুসলমানদের সংশোধনের জন্য পারশ্য বংশীয় মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন ।

আলোচ্য হাদীসে যেখানে বলা হয়েছে মাহ্দী ফাতেমার বংশ থেকে হবেন। এই হাদীসটি কেন গ্রহণযোগ্য নয় তার কারণ নিচে দেয়া হল।

কারণ-১, রসূল(সা.)-এর তিরোধানের পর তার নিকটতম যুগে হাদীসের যে সংকলন করা হয়েছে তা হল, সাহীফা হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ। নিকটতম যুগে

সংকলিত এ হাদীস সংকলনে মাহ্‌দী ফাতেমার বংশ থেকে আসবেন বলে কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

কারণ-২, এর পর সবচেয়ে নিকটবর্তী যুগে যে হাদীস সংকলন একত্রিত হয় তা হল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক। এর মাঝেও উক্ত হাদীসের কোন নাম গন্ধ নাই।

কারণ-৩, সিহাহ সিত্তার ছয়টি হাদীসের সংকলনের মাঝে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থের নাম বুখারী শরীফ। বুখারী শরীফের মত প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মাঝেও ফাতেমার বংশ থেকে ইমাম মাহ্‌দীর আগমন ঘটবে এমন কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং মাহদী সংক্রান্ত কোন হাদীসই এতে সংকলিত নেই।

কারণ-৪, সিহাহ্ সিত্তার মাঝে দ্বিতীয় গ্রহণযোগ্য হাদীসগ্রন্থের নাম 'মুসলিম শরীফ'। এতেও মাহদী(আ.) ফাতেমার বংশধর হবেন এরও কোন বর্ণনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মুকাদ্দামা ইবনে খালদূনে লেখা আছে, ইমাম মাহদী(আ.) সংক্রান্ত যাবতীয় বর্ণনা 'কুল্লুহা ওয়াহিয়াতুন' সবগুলোই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। হ্যা, ব্যতিক্রম ধর্মী খুবই কম সংখ্যক এর মাঝ থেকে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

মজার ব্যাপার হল, যেখান থেকে 'আল্লামা' মজিদ সাহেব আপত্তি তুলে ধরেছেন তার মাঝেই ইমাম মাহদী(আ.) বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন আর এমনভাবে স্পষ্ট করেছেন যাতে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও এর অনুবাদ দেয়া হল।

"একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত, পুরনো পুরনো মুসলিম ফিরকাগুলো এমন এক মাহদীর অপেক্ষা করছে যিনি হুসাইন(রা.)-র মা হযরত ফাতেমা(রা.)-র বংশধর হবেন। তারা এমন এক মসীহর জন্যও অপেক্ষায় আছে যিনি এই মাহ্‌দীর সাথে যোগ দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ করবেন। কিন্তু আমি এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছি, এসব ধ্যান-ধারণা ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা আর এমন ধারণা পোষণকারীরা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। এমন মাহ্‌দীর অস্তিত্ব কেবল এক কল্পিত সত্তা যা অজ্ঞতাবশত মুসলমানদের মন-মস্তিস্কে স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃত সত্য হল, ফাতেমার সন্তাদের মধ্য থেকে কোন মাহ্‌দী আসবে না আর এমনসব হাদীস মওযূ' এবং ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এগুলো সম্ভবত আব্বাসীয় শাসনামলে লেখা হয়েছে। আর সঠিক তথ্য হল, এক ব্যক্তি ঈসা(আ.)-এর নামে আগমন করবেন যিনি যুদ্ধও

করবেন না আর রক্তপাতও ঘটাবেন না। তিনি বিনয়, নম্রতা, সহিষ্ণুতা এবং অকাট্য দলিলপ্রমাণাদির মাধ্যমে মানুষের মনকে সত্য ধর্ম মূখী করবেন। তাই খোদা তা'লা স্পষ্ট নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন, সেই ব্যক্তি তুমিই এবং তিনি আমার সত্যায়নে ঐশী নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছেন। আর ভবিতব্য বিষয়াদি অজানা রহস্য আমার কাছে উন্মোচন করেছেন। আর এমনসব তত্ত্বজ্ঞান আমাকে তিনি দান করেছেন যা বিশ্ববাসীর অজানা। কোন খুনি মাহদী আসবে না- আমার এ বিশ্বাস অপরাপর সকল মুসলমানের বিশ্বাস থেকে ভিন্ন।"

পাঠকবৃন্দ, এখানে মির্যা সাহেব কেবল সেই কল্পিত মাহ্দীর বিশ্বাসকে অস্বীকার করেছেন যিনি রক্তপাত ঘটাবেন আরসশস্ত্র যুদ্ধ করবেন। কিন্তু যে মাহদীর সংবাদ মহানবী(সা.) দিয়েছেন তাঁর কথা তিনি কখনও অস্বীকার করেন নি বরং তিনি নিজে সেই প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবি করেছেন।

অতএব স্পষ্ট, হযরত মির্যা সাহেব সঠিক হাদীসের বিরুদ্ধে নন, পরবর্তীতে মহানবী(সা.)-এর প্রতি বানিয়ে যে কথা আরোপ করা হয়েছে তার সমালোচনা তিনি করেছেন এসব লেখায়। বিশেষ করে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী তাদের কল্পনাপ্রসূত রক্তচোষা মাহদীর অপেক্ষায় রত মুসলমানদের। প্রকৃত মাহদীই হলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্(আ.) যিনি শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে আসবেন। আর সেই মহাপুরুষ এসে গেছেন।

এই পরিচ্ছদের শেষাংশে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ আপত্তি করে বলেছেন, হযরত মির্যা সাহেব নাকি বলেছেন, যারা ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় আছে তারা মস্তবড় ভুলের মাঝে আছেন। উপরে তাঁর লেখা পুরো উদ্ধৃতিটির অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রতিলিপিও দেয়া হয়েছে পাঠক বুঝতে পারছেন, মির্যা সাহেব প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমন অস্বীকার করেন নি বলেছেন কল্পিত খুনি মাহদীর কথা যিনি এসে রক্তপাত ঘটাবেন। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের প্রতারণা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

আপত্তি : মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে অমর্যাদাকর বক্তব্য।

হযরত মসীহ মওউদ (মির্যা কাদিয়ানী) এ ব্যাপারে অনেক তাগিদ দিয়েছেন যে, এখানে (কাদিয়ান) যে ব্যক্তি বারবার আসবে না, তার ঈমানের ব্যাপারে আমার আশংকা আছে। যে কাদিয়ানের সাথে সম্পর্ক রাখবে না, সে আলাদা হয়ে যাবে। তোমরা সতর্ক হও। যাতে তোমাদের মধ্যে কেউ আলাদা না হয়।

তারপর এই তাজা দুধ (মক্কা-মদীনা) আর কতদিন থাকবে? একদিন তো মায়ের দুধও শুকিয়ে যায়। মক্কা-মদীনার বুক থেকে কি সেই দুধ এখনো শুকায়নি? *(হাকীকতে রুইয়া ৪৬)*

উত্তর: যারা মসীহ্ মাওউদ(আ.)-এর হাতে বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তে দীক্ষা নিবে তাদের জন্য তাদের ইমামের জন্মভূমি, তার আবাসস্থল, তাঁর সমাধীস্থল অবশ্যই পবিত্র ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনের বিকাশস্থল এবং পবিত্র ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। আপত্তিকারীর বিশ্বাস মতে যে বা যিনিই সত্যিকার ইমাম মাহদী বা মসীহ্ হয়ে আসবেন তাঁর জন্মভূমি ও আবাসস্থল সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি কী হবে?

আপত্তিঃ ছায়া হজ্জ বাদে (কাদিয়ানের জলসা) মক্কার হজ্জ রসহীন। *(পয়গামে সুলহ ১৯ এপ্রিল ১৯৩৩)*

উত্তর : ছায়া হজ্জের কোন বিধান ইসলামে নেই। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব যে পবিত্রতার উদ্ধৃতি দিয়ে ছায়া হজ্জের প্রসঙ্গ টেনেছেন এই পত্রিকাটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পত্রিকাই নয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর মৃত্যুর আগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে ইসলামী শিক্ষা ব্যক্ত করে ১৯০৮ সালে পয়গামে সুলেহ নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। 'আল্লামা' ১৯শে এপ্রিল ১৯৩৩ সালের পয়গামে সুলেহ এক পত্রিকার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। এই প্রত্রিকাটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক মতবাদ প্রচারে লিপ্ত আর আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে ব্যস্ত। এই বিদ্বেষীদের উদ্ধৃতি দিয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বক্তব্য উপস্থাপন করা আপনার মত 'গবেষক আল্লামা'-র শোভা পায় না। এখন দেখুন হজ্জ সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেবের শিক্ষা কি? তিনি বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, 'যার জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে আর এই হজ্জ পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই সে যেন হজ্জ করে। পুণ্যকাজ সুচারুরূপে আদায় কর আর পাপ ও নোংরামী অবজ্ঞাভরে পরিহার কর। মনে রাখবে, নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তাকওয়াশূন্য কোন আমল গৃহীত হয় না। কেননা তাকওয়াই হল সকল পুণ্যের মূল। যে কাজে এই মূল নষ্ট হবে না তার কর্মও বৃথা যাবে না। (রূহানী খাযায়েন ১৯শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫)

আপত্তিঃ মানুষ নফল হজ্জ করার জন্য যায়। কিন্তু এখানে (কাদিয়ানে) সওয়াব বেশি। গাফেল ও উদাসীন থাকলে ক্ষতি। কেননা, ধারাটা আসমানী আর হুকুমটা খোদায়ী। (রূহানী খাযায়েন ৫/৩৫২)

উত্তরঃ এখানে কি মক্কার ফরয হজ্জ পালন করতে ঘুণাক্ষরেও না করেছেন? কক্ষনো না। বরং ইস্তেখারা করার জন্য কাদিয়ানে এসে দোয়া করার জন্য বিশেষ একজন অতিথিকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যাদের জন্য হজ্জ ফরয হয় নি তারাও অনেক সময় আদেশটির সম্মান রক্ষার্থে নফল হজ্জ করতে চলে যায়। আপনি যুগের ইমাম ও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আগমনবার্তা পেয়ে তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য কি একটু কষ্ট করে ইস্তেখারা করবেন না? কাদিয়ানে এসে আমার কাছে থেকে ইস্তেখারা করলে আমিও আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করতে পারতাম যেন আল্লাহ্ আপনাকে সত্য জানিয়ে দেন। অতএব এ বাক্যে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে মান্য করার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে, ফরয হজ্জকে খাটো করা হয় নি। হজ্জ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেবের শিক্ষাটি আবার পড়ে নিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেন, "যার জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে আর এই হজ্জ পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই সে যেন হজ্জ করে।" (রূহানী খাযায়েন ১৯শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫)

আপত্তিঃ এই সরকারের (বৃটিশ সরকার) অধীনে যে নিরাপত্তা পাচ্ছি তা মক্কা মুয়ায্যামা ও মদীনায়ও পাওয়া সম্ভব নয়। রোম সম্রাটের রাজধানী কুস্তুনতুনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপল) এ নিরাপত্তা পাওয়া তো সম্ভবই নয়। *(রূহানী খাযায়েন ১৫/১৫৬)*

উত্তরঃ একেবারে সত্য কথা, মক্কা ও মদিনায় ব্যাখ্যাগত বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী মুসলমানদের তখনও নিরাপত্তা ছিল না, আজও নিরাপত্তা নেই। হযরত মির্যা সাহেবের যুগে মক্কা ও মদীনা তুর্কী সুলতানের অধীনে ছিল। কেবল আহমদীদের কথা কেন বলবেন, সাংগঠনিকভাবে তবলীগি জামা'তের কোন প্রতিষ্ঠান আজও কি সেখানে আছে? সেখানে কি জামায়াতে ইসলামীর কোন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম আছে? অথবা হেফাযতে ইসলামের কোন আনুষ্ঠানিক

কার্যক্রম আছে? ওয়াহাবী মতাবলম্বী ছাড়া কেউ কি সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে মত প্রচার বা প্রকাশ করতে পারে?। বিষয়টি মক্কা মদিনাকে খাটো করার জন্য নয়, বরং মক্কা মদিনার আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে ইসলামের খাঁটি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে ব্রিটিশ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অধীনে যে সুযোগ সুবিধা তিনি এবং মুসলমানরা লাভ করেছেন তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি এ কথা বলেছেন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর একটি উদ্ধৃতি দু'স্থানে দু'রকম করে উল্লেখ করেছেন। একস্থানে মির্যা সাহেব মুহাদ্দাস শব্দ লিখেছেন আর অপর স্থানে এ শব্দটি পরিবর্তন করে নবী শব্দ লিখে মুজাদ্দিদে আলফে সানির প্রতি আরোপ করেছেন।

জবাবঃ প্রথমত, মির্যা সাহেব রূহানী খাযায়েন ১/৬৫ পৃষ্ঠায় এমন কোন কথা বলেন নি। হ্যাঁ, মির্যা সাহেব তার বিভিন্ন পুস্তকে মুজাদ্দিদে আলফে সানি(রহ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি ও বক্তব্য তুলে ধরেছেন। রূহানী খাযায়েন ১ম খণ্ডের ৬৫২ পৃষ্ঠায়ও মুজাদ্দিদে আলফে সানি(রহ.)-এর বরাতে একটি বক্তব্য রয়েছে। আর সেই বক্তব্য হল, নবী হওয়া ছাড়াও উম্মতের সাধারণ সদস্যরাও আল্লাহ্ তা'লার সাথে বাক্যালাপের সৌভাগ্য পেতে পারে। আর এমন সৌভাগ্যবানদের মুহাদ্দাস বলা হয়। পাঠক, মনে রাখতে হবে এখানে নবী ছাড়া সাধারণ উম্মতীদের কথা বলা হচ্ছে। এখন মির্যা সাহেব রূহানী খাযায়েন ২২/৪০৬ পৃষ্ঠায় যে বক্তব্য রেখেছেন তা পড়লেই পাঠকের কাছে 'আল্লামা'র প্রতারণা ও বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমে মনে রাখতে হবে, মির্যা সাহেব রূহানী খাযায়েন ২২/৪০৬ অংশে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা মুজাদ্দিদ আলফে সানির অবিকল মূল পাঠ নয়। মুজাদ্দিদ আলফে সানির ভাষা ফারসী মির্যা সাহেব মুজাদ্দিদে আলফে সানির বক্তব্যকে উর্দূ ভাষায় ভাবানুবাদ করে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মুজাদ্দিদে আলফে সানি(রহ.)-এর বক্তব্যের আলোকে বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'আল্লামা'র আপত্তি হল, মুজাদ্দেদ আলফে সানি(রহ.) নবী শব্দ ব্যবহার করেন নি। এখন দেখা যাক, মির্যা সাহেব মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানীর আলোকে যে কথা

বলেছেন তার সাথে ইমাম রাব্বানীর বক্তব্যের মিল পাওয়া যায় কিনা। এখন মাকতুবাত ইমাম রাব্বানীর উদ্ধৃতি দেখে নেই।

মুজাদ্দিদে আলফে সানি(রহ.)-এর উদ্ধৃতির অনুবাদ হল, পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত রূপক আয়াতসমূহ এগুলোর বাহ্যিক অর্থে নয় বরং ব্যাখ্যাকৃত অর্থে গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তালা পবিত্র কুরআনে বলেন, এসবের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতএব বুঝা গেল, রূপক আয়াতগুলো আল্লাহর দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যাযোগ্য এবং এসবের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ প্রকৃত উদ্দেশ্য নয় আর আল্লাহ্ তা'লা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমদেরকেও এসবের ব্যাখ্যার জ্ঞান দিয়ে থাকেন। এরচেয়ে উন্নততর 'অদৃশ্যের জ্ঞান' যা কেবল খোদা তা'লারই কর্তৃত্বাধীন এই পর্যায়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তালা কেবল তার রসূলদেরই দিয়ে থাকেন। 'হাত' অর্থ 'ক্ষমতা' আর 'চেহারা' অর্থ 'আল্লাহর সত্তা'– বিষয়টি কখনও এতটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই উন্নত ব্যাখ্যাসম্বলিত জ্ঞান তিনি কেবল তার একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ বান্দাদেরকেই প্রদান করে থাকেন। (মকতুবাত ইমাম রাব্বানী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৬, পত্র নম্বর ৩১০)

এই উদ্ধৃতিতে হযরত ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.) স্পষ্টভাবে লিখেছেন, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান বা রহস্যাবলি আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে উম্মতের মনোনিত বান্দাদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু যাদের কাছে আল্লাহ্ তা'লা তার বিশেষ অদৃশ্য-সংবাদ প্রকাশ করেন তিনি রসূল হয়ে থাকেন।

অতএব মির্যা সাহেব মোটেও খিয়ানত করেন নি। একস্থানে নবী-রসূলকে বাদ দিয়ে সাধারণ উম্মতীদের কথা বলা হয়েছে আর অপর স্থানে উম্মতের বিশেষ মনোনিত বান্দাদের কথা বলা হয়েছে যেসব বান্দাদের জন্য মুজাদ্দিদ আলফে সানি(রহ.) নিজে রসূল শব্দ ব্যবহার করেছেন। অতএব 'আল্লামা'-র আপত্তি ধোপে টেকে না বরং সুগভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও আমানতদারীর সাথে বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার কৃতিত্ব মির্যা সাহেবের স্কন্ধেই বর্তায়।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব নবী হবার দাবী করেছেন

জবাবঃ নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা বিষয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'ত ও আহমদীদের মাঝে কোন বিরোধ নেই। শুধুমাত্র এর ব্যাখ্যাগত সূক্ষ্মতায় মতানৈক্য আছে। মুসলমানদের সকল ফিরকা মহানবী(সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস করেও শেষ যুগে একজন নবীর প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। আমরাও এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। সকল ফিরকা একমত, মহানবী(সা.) খাতামান নবীঈন হওয়া সত্ত্বেও শেষ যুগে ঈসা নবীউল্লাহ্ কিয়ামতের পূর্বে আগমন
করবেন। আমরাও এ বিশ্বাসের সাথে একমত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বলে, পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলী ঈসা(আ.) স্বাভাবিকভাবে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করে ইন্তেকাল করেছেন তাই তাঁর বাহ্যিক আগমনের অর্থ গ্রহণযোগ্য নয় বরং রূপক অর্থ প্রযোজ্য হবে। আর অন্যান্য ফিরকার দাবী হল, দু' হাজার বছর বয়সী ঈসা-ই এখনও সশরীরে ৪র্থ আকাশে জীবিত আছেন, তাই তিনিই আসবেন। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) রূপকার্থে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হবার দাবী করেছেন। মির্যা সাহেব মহানবী(সা.)-কে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র কোন নবুওয়তের দাবী করেন নি। যারা বলে মির্যা সাহেব স্বতন্ত্র নবুওয়তের দাবী করেছেন তারা মিথ্যা বলে। মির্যা সাহেব তাঁর এক পুস্তকে তার সারা জীবনের লেখার সারাংশ ও মূল মর্ম তুলে ধরেছেন আশা করি এ লেখাটি পড়লে পাঠকের মনে আর কোন সংশয় থাকবে না।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.) বলছেন,

'যেসব স্থানে আমি নবুওত বা রিসালত অস্বীকার করেছি কেবল 'স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে আমি শরীয়তবাহক নই'– এ অর্থেই করেছি আর আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ নবীও নই। কিন্তু আমি আমার অনুসৃত রসূল(সা.)-এর কাছ থেকে আত্মিক কল্যাণ লাভ করে আর নিজের জন্য তাঁর নাম লাভ করে তাঁর মধ্যস্থতায় খোদার পক্ষ থেকে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি, তবে নতুন কোন শরীয়ত ছাড়া- এ আঙ্গিকে নবী আখ্যায়িত হবার বিষয়টি আমি কখনও অস্বীকার করি নি। বরং এ অর্থেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নবী ও রসূল নামে ডেকেছেন" (এক গালাতি কা ইযালা, পৃষ্ঠা- ৮)।

তিনি আরো বলেন, 'এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া সমস্ত নবুওত বন্ধ। শরীয়তবাহক কোন নবী আসতে পারে না। শরীয়ত বিহীন নবী হতে পারে তবে কেবল সে-ই যে প্রথমে উম্মতী হবে" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২৫)।

এক ধরনের নবুওয়তের অস্বীকার, আবার এক ধরনের নবুওতের দাবী করা স্ববিরোধ নয়। যেমন, কেউ যখন বলে, 'আমি নৌপথে চট্টগ্রাম যাই নি। তবে আমি রেলপথে কয়েকবার চট্টগ্রাম গিয়েছি।' এ বক্তব্য দু'টির মাঝে কোন স্ববিরোধ নেই। এক ধরনের পথে যাত্রা না করার কথা হয়েছে আবার আরেক ধরনের পথে যাত্রা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা বলা হচ্ছে। আবার আরেকটি অভিব্যক্তি দেখুন, 'আমি চাকুরীর টাকা দিয়ে এ বাড়িটি কিনি নি। তবে পৈত্রিক সম্পত্তির বিক্রিলব্ধ টাকা দিয়ে এ বাড়িটি ক্রয় করেছি।' বাড়িটি ক্রয় করার কথা অস্বীকার করা হচ্ছে না কেবল এটি ক্রয় করার মূলধন কীভাবে অর্জিত হল সে বিষয়ে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে মাত্র। ঠিক এভাবেই হযরত মির্যা সাহেব স্বয়ংসম্পূর্ণ তথা নিজ ব্যক্তিগত গুণে নবুওত অর্জন অস্বীকার করে এসেছেন, শরীয়তবাহক নবুওয়ত লাভের কথাও অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মহানবী রসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর মধ্যস্থতায় ও আনুগত্যে উম্মতী নবুওয়ত লাভের কথা কখনও অস্বীকার করেন নি। আগাগোড়া তাঁর সমস্ত বক্তব্যের সারাংশ তিনি নিজেই টেনে দিয়েছেন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব জিহাদ রহিত করেছেন

জিহাদ রহিত করা হয়েছে শুনে উলামায়ে উম্মত আমাদের সম্মানিত আলেম সম্প্রদায়ের মাঝে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অথচ বিষয়টি একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিষয়টি হারাম হালাল ঘোষণা দেয়ার নয়। প্রত্যেক ইবাদতের জন্য শর্ত নির্ধারিত আছে। শর্ত পূর্ণ হলে সেই ইবাদতটি পালনীয় হয়, তা নাহলে নয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, হজ্জ ফরজ এ বিষয়ে কি কারও কোন সন্দেহ আছে। এবার বলুন, হজ্জ কি আমরা রমযান মাসে পালন করতে পারি? হজ্জ ফরয বলে কি তা ঋণগ্রস্থদের ও অসুস্থদের জন্যও ফরয? ঠিক একইভাবে যাকাত দেয়াও ফরয। কিন্তু একজন ভিক্ষারী কি যাকাত দিতে বাধ্য? মোটেও না। কেননা তার যাকাত প্রদানের নিসাব পূর্ণ হয় নি। ঠিক একইভাবে 'সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ' বা 'জিহাদ বিস্‌সাইফ'-এর জন্য খুব কড়া শর্ত রয়েছে। আর শর্তগুলোর মাঝে প্রধানতম শর্ত হল, ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য আক্রান্ত হতে হবে এবং দীর্ঘদিন

ধরে নির্যাতিত হতে হবে। রসূল বা যুগ-ইমাম মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি পেয়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের নির্দেশ যুগ-ইমাম দিবেন– যে কেউ এ যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে মুসলমানরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছে। ধর্মের কারণে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার করা তো দূরের কথা বরং তারা ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা দান করেছে। যেসব মসজিদে শিখরা আস্তাবল গড়েছিল সেসব মসজিদ মুসলমানরা ফিরে পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনামলে। ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানকারী এমন সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করা কুরআন ও রসূলের সুন্নত অনুযায়ী বৈধ নয়। হযরত মির্যা সাহেব কেবল একথার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। তিনি নিজের পক্ষ থেকে নতুন কোন বিধান দেন নি।

পবিত্র কুরআনে লেখা আছে **'হাল জাযাউল এহসানি ইল্লাল ইহসান'** অর্থাৎ কেউ অনুগ্রহ করলে তার অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। আল্লাহ তা'লা নিজের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন 'শাকেরুন আলীম' অর্থাৎ তিনি গুণগ্রাহী। কারও মাঝে তিনি সামান্য গুণ দেখলে তিনি তার মূল্যায়ন করেন। আল্লাহ্ আমাদেরকেও তাঁর গুণে গুণান্বিত হবার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিনস্থ মুসলমানদের আবশ্যক দায়িত্ব ছিল ও আছে তারা যেন নিজেদের হারানো ধর্মীয় স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ায় এই সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করে বরং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ কারণে তিনি বারবার জিহাদের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আর তিনি বলেছেন অনুগ্রহশীল সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

মে ১৯০০ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন: "আমি আপনাদের কাছে একটি বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এসেছি আর তা হল, এখন অস্ত্রযুদ্ধ রহিত কিন্তু আত্মশুদ্ধির জিহাদ বলবৎ আছে।" (গভর্ণনমেন্ট আংগ্রেজী আওর জিহাদ, পৃষ্ঠা-১৫, রূহানী খাযাইন, ১৭শ খণ্ড)

তিনি আরো বলেন, "আর যদিও সিমান্ত প্রদেশে এবং আফগানের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন শিক্ষা প্রচারকারী মৌলভী অগণীত রয়েছে কিন্তু আমার মনে হয়, পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্তানও এসব মৌলভীমুক্ত নয়। যদি মাননীয় সরকার এদশের সকল মৌলভীকে এ ধরনের চিন্তাধারা থেকে পবিত্র ও মুক্ত বলে বিশ্বাস করে থাকে তাহলে তাদের এই বিশ্বাস বা ধারণা পুঃনবিবেচনার যোগ্য। আমার মতে মসজিদে গা ঢাকা দেয়া নির্বোধ অগ্নীশর্মা মোল্লা এসব নোংরা চিন্তা চেতনা থেকে

পবিত্র বা মুক্ত নয়। আমি সত্য সত্য বলছি, তারা যেমন সরকারের বিভিন্ন অনুগ্রহের অবজ্ঞা করে একদিকে রাষ্ট্রের সুপ্ত শত্রু তেমনিভাবে তারা খোদা তালার দৃষ্টিতেও অপরাধী এবং অবাধ্যতাকারী। কেননা আমি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, খোদা তালার কালাম এভাবে নিরপরাধদের হত্যা করার শিক্ষা ঘুনাক্ষরেও দেয় নি। আর যে এমন ধারণা রাখে সে ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত।" (গভর্ণনমেন্ট আংগ্রেজী আওর জিহাদ, পৃষ্ঠা-২০, রূহানী খাযাইন, ১৭শ খণ্ড)

পাঠকদের কাছে একথা অতি স্পষ্ট, শর্ত পূর্ণ হয় নি বিধায় হযরত মির্যা সাহেব জিহাদকে রহিত ঘোষণা করেছেন। হারাম তথা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন নি বরং যুগের চাহিদা অনুযায়ী যেহেতু ধর্ম পালনে কেউ বাধা দিচ্ছে না তাই মির্যা সাহেব এখনকার মত সশস্ত্র যুদ্ধ রহিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা সাহেবের সমসাময়িক কিছু প্রখ্যাত আলেমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি– স্যার আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল যাকে বর্তমান যুগের আলেম-উলামা অনেক বড় বড় উপাধিতে ভূষিত করে থাকেন, তিনি কী ভাষায় ব্রিটিশদের গুণ গেয়েছেন তা-ও পাঠকদের জানা প্রয়োজন। রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তিনি যে শোকগাথা লিখেছিলেন তার একটি অংশ হল,

'রানির জানাযা কাঁধে উঠেছে, হে ইকবাল তুমি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সেই পথে নিজেকে বিছিয়ে দাও। পরিস্থিতি অবিকল সেরকমই যদিও এ মাসের নাম ভিন্ন। আমরা এ মাসের নাম মুহাররম প্রস্তাব করছি' ('বাকিয়াতে ইকবাল', সংকলক সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ মুঈনী এম.এ. অক্সন)

রানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর সময় মুসলমানরা ঈদ উদযাপন করছিল। এ উপলক্ষে ইকবাল বলছেন, লোকেরা বলে আজ নাকি ঈদের দিন। হলে হতেও পারে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে আজ যদি ঈদের দিন না হয়ে আমাদের মৃত্যুর দিন হত বিষয়টি অধিক সহনীয় ছিল।' পাঠকবৃন্দ! যে ব্যক্তি রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে এমন সব কথা লিখতে পারে, এমন আবেগের অতিরঞ্জন লিখতে পারে এবং আবেগের আতিশয্যে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর দিনকে মুহাররম এবং ঈদের দিনকে শোকের দিন হিসেবে তুলনা করতে দ্বিধান্বিত নয়– তাকে ইসলামের পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ বলতে বর্তমান যুগের আলেমদের বাঁধে না। কিন্তু যিনি রসূল(সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী অনুগ্রহশীল রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে শেখান তাঁর বিরুদ্ধে যত অবান্তর আপত্তি! এটা কেমন বিচার!

আবর দেখুন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী ব্রিটিশ সরকারের বিষয়ে তার ধারণা লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'রোমান সম্রাট একজন ইসলামী বাদশাহ কিন্তু সাধারণ শান্তি এবং সুব্যবস্থাপনার দিক থেকে ব্রিটিশ সরকার আমাদের মুসলমানদের জন্য কম গর্বের বিষয় নয়। আর বিশেষ করে 'আহলে হাদীসের' জন্য এই সরকার শান্তি এবং স্বাধীনতার দিক থেকে বর্তমান সময়ের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো (আরব, রোম তথা কুসতুনতুনিয়া, ইরান, খুরাসান) থেকেও বেশি গর্বের অধিকারী। (ইশাআতুস সুন্নাহ, খণ্ড-৬, নম্বর-১০, পৃষ্ঠা ২৯২-২৯৩)

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য অন্ধভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন। আর এতে তিনি এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছেন যে, লেখার সময় তার দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। তাই তিনি ইতিহাসের মারাত্মক বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তার মতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদ ছিল আর এই জিহাদী চেতনা রোধকল্পেই নাকি ব্রিটিশরা তাদের হাতের পুতুল হিসাবে মির্যা সাহেবকে দাঁড় করিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ!! হযরত মিযা সাহেব ব্রিটিশদের স্বরোপিত বৃক্ষ ছিলেন নাকি আল্লার প্রত্যাদিষ্ট ছিলেন তা পরে আলোচনা করব। তার আগে চলুন, যে বিষয়টিকে সূত্র ধরে তিনি এত বড় একটি গবেষণা কাজ চালিয়েছেন সেই সূত্রটি আদৌ ধোপে টেকে কিনা সেটি যাচাই করে দেখি।

যে সব আলেম উলামার বরাতে আজ 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ ও তার সমমনারা আহমদীয়া বিরোধী কার্যকলাপ বা আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাদের দৃষ্টিতে ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের মূল্যায়ন শুনুন।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত আলেম ও নেতা আহমদীয়া জামা'তের প্রধান বিরোধী মৌলভী মুহাম্মদ হোসাইন বাটালভী তাঁর পত্রিকায় বলেছেন, '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যে সব মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিল তারা ভয়ানক পাপিষ্ঠ এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী তারা ছিল নৈরাজ্যবাদী, বিদ্রোহী ও দুষ্কৃতিকারী' (ইশাআতুস সুন্নাহ, ৯ম খণ্ড, নম্বর-১০, পৃষ্ঠা ৪৯)

তিনি আরও বলেন, 'এ সরকারের সাথে যুদ্ধ করা বা তাদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা (তারা মুসলমান ভাই-ই হোক না কেন) স্পষ্ট বিদ্রোহ এবং হারাম কাজ।' (ইশাআতুস সুন্নাহ, ৯ম খণ্ড, নম্বর-১০, পৃষ্ঠা ৩০৯)

তিনি কেবল তার নিজ পত্রিকাতেই তার এই সিদ্ধান্ত ছাপান নি বরং তার রচিত বই আল ইকতেসাদ ফি মাসাইলিল জিহাদ ২৫ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'...এই সকল বক্তব্য ও দলিল দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, ভারতবর্ষ খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অধীন হওয়া সত্ত্বেও এটি 'দারুল ইসলাম' (যেখানে সশস্ত্র ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ)। কোন মুসলমান রাজা– তিনি আরবেরই হোন, আরবের বাইরেরই হোন, সুদানী মাহদী হোন বা ইরানের সুলতান শাহই হোন কিংবা খুরাসানের আমীরই হোন এই রাজত্বের বিরুদ্ধে কোন বাদশাহর পক্ষ থেকে ধর্মযুদ্ধ করা বা আক্রমণ করা কোনমতেই বৈধ নয়।'

ইশাআতুস সুন্নাহ পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১০ম সংখ্যায় একই বিষয়ে তিনি আবার লিখেছেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মুসলমানদের জন্য হারাম।'

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব এই 'হারাম' কাজকে 'হালাল' ঘোষণা করে নিজের গোড়া নিজেই কেটে দিয়েছেন। 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব যদি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ফতোয়ায় সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তাহলে স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেব যিনি অখণ্ড ভারতের মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার পথিকৃত এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তার বক্তব্য শুনুন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে যেসব মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল তাদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'দুষ্ট প্রকৃতির কিছু মানুষ জাগতিক লোভ লালসায় নিজ স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে নিজেদের মনগড়া চিন্তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক অজ্ঞদের উস্কানী দেয়া এবং নিজেদের সাথে কিছু লোক ভেড়ানোর নাম জিহাদ রেখেছে। আর এ ঘটনাটি ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হারামযাদাদের কার্যকলাপের মাঝে একটি। এটি জিহাদ অবশ্যই ছিল না। (স্যার সৈয়দ আহমদ রচিত 'বাগাওয়াতে হিন্দ' পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৪)

এতেও যদি 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তাহলে ১৮৫৭ সালের তথাকথিত জিহাদের বিরুদ্ধে বেরলভী ফিরকার নেতা মৌলভী সৈয়দ আহমদ রেজা খান সাহেবের বক্তব্য শুনুন, তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ হল 'দারুল ইসলাম'। একে 'দারুল হার্‌ব' (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের স্থান) বলা কখনও সঠিক নয়" ('নুসরতুল আবরার', পৃষ্ঠা ১২৯)।

আপত্তিঃ মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভি(রহ.) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভি(রহ.) উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে শিখদের বিরুদ্ধে ধর্ম যুদ্ধ করেছিলেন। ত্রয়োদশ হিজরি শতাব্দির মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব পাঠানকোটে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। এর উল্লেখ করে মূল হিন্দুস্তানী ভূখন্ডে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করাটা বৈধ ছিল বলে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা এ কথা ভুলে যান, হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী(রহ.) কখনও ইংরেজ শাসন বা শাসকদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করেন নি বরং অত্যাচারী অনাচারী এবং মুসলিম বিদ্বেষী শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তার জীবনী রচয়িতা মোহাম্মদ থানেশ্বরী বলেন,

'একজন প্রশ্নকারী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি এতদূরে গিয়ে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন কেন? এদেশের বর্তমান শাসক ইংরেজরাও কি ইসলামের অস্বীকারী নয়? দেশের অভ্যন্তরে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে ভারতবর্ষ তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন না কেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ইংরেজ সরকার যদিও ইসলামের অস্বীকারকারী কিন্তু তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অন্যায় অনাচার করে না ...এবং তাদেরকে ধর্মীয় কর্তব্য পালনে ও ফরয ইবাদতে বাধা দান করে না। আমরা তাদের দেশে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করি ও ধর্ম পালন করি। তারা কখনও এটি নিষেধ করে না এবং এই ব্যাপারে বাধাও দেয় না। ... আমাদের আসল কাজ হল খোদার তওহীদ ও মহানবী(সা.)-এর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা আমরা সেই কাজ নির্দ্বিধায় এ দেশে করতে পারছি। তাহলে আমরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কী কারণে জিহাদ করব এবং ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কেন আমরা অযথা উভয় পক্ষের রক্তাপাত ঘটাব? এই সদুত্তর শুনে প্রশ্নকারী চুপ হয়ে গেল এবং জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে গেল।" ('সাওয়ানেহ আহমদী কালাঁ' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭১)

আল্লামা শিবলি নোমানী বলেছেন, রসূলুল্লাহ(সা.)-এর স্বর্ণযুগ হতে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে, তারা যে সরকারের অধীনে থাকে সে সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ও আজ্ঞানুবর্তি থাকে। এটি কেবল তাদের নীতিই ছিল না বরং এটা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাও বটে, পবিত্র কুরআন হাদীস ও ফিকাহ

সবগুলোতে যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ রয়েছে। ('শিবলী রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭১)

মুসলমানদেরকে ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদানকারী একটি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ যে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ও হারাম কাজ এ কথা সে যুগের আলেমরাও জানতেন আর আজকের আলেমরাও জানেন। আমাদের পক্ষ থেকে এ উত্তর ছাপার সময় বাংলাদেশের লক্ষাধিক আলেম স্বাক্ষরিত ও প্রকাশিত জঙ্গিবাদ বিরোধী ফতোয়াও এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্য একটি 'হারাম' কাজকে 'হালাল' বলে বরং ইসলামী জিহাদ বলে চালিয়ে দেয়া কতটুকু ইসলামী– আমরা বিবেকবান পাঠকদের কাছে তা জানতে চাই।

আপত্তিঃ কাদিয়ানী ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করেও অনেকে মুরতাদ হয়েছেন।

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেব এর বক্তব্য হল, মির্যা সাহেবের মিথ্যাবাদী হবার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন আর যাদেরকে তিনি তাঁর আস্থাভাজন বলে মনে করতেন তাদের কয়েকজন তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে এবং তাঁকে কাফের ও মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়েছে। তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকলে কেউ তাঁকে পরিত্যাগ করত না।

উত্তর: 'আল্লামা'-র অবগতির জন্য বলছি, সর্বশেষ ও সম্পূর্ণ সত্য ধর্ম ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং স্বয়ং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ। সবচেয়ে বড় এ সত্যকে আর সর্বশ্রেষ্ঠ এ নবীকে মান্য করার পরও হতভাগাদের একাংশ প্রকাশ্যভাবে ধর্মত্যাগ করেছে তথা 'মুরতাদ' হয়েছে। 'আল্লামা' এ জামা'ত থেকে সরে যাবার কারণে হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদি তার এই প্রশ্ন সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা মুরতাদ হয়েছিল তাদের বিষয়টি তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ইহকালীন জীবন যে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র আর এ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ যে ঈমানের পরীক্ষা দিতে দিতে পার হয় এ বিষয়ে আলেম মাত্রই অবগত আছেন। অতীতেও বহু মানুষএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে, তদনুযায়ী

আহমদীয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েও হয়েছে। কিন্তু এতে সত্যবাদীর সত্যতা বা সত্য জামা'তের ঈমান ম্লান হয় না।

কেউ ধর্মত্যাগ করে চলে গেলে মুসলমানদের যে কোন ক্ষতি হবে না একথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ্ কুরআন শরীফে আয়াত নাযেল করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّـهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মধ্য থেকে যে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে যায় এর বিনিময়ে আল্লাহ্ এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন যাদেরকে আল্লাহ্ ভালবাসবেন এবং যারা আল্লাহকে ভালবাসবে। (সূরা মায়েদাঃ ৫৫-এর প্রথমাংশ)

অতএব ইসলাম গ্রহণ করার পরও যে অভাগারা সত্যপথ পরিহার করতে পারে একথা স্পষ্টভাবে আল-কুরআনেই লেখা আছে। আর একথাও লেখা আছে, এরা ফিরে গেলে সত্য ধর্মের কোন ক্ষতিই হবে না বরং আল্লাহ্ এদের পরিবর্তে নতুন নতুন জাতি ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসবেন। আর এটি সত্য জামাতের লক্ষণ। তাদের একজন ফিরে গেলে আল্লাহ তাদের সংখ্যা কমান না বরং অনেকগুণ বৃদ্ধি করে দেন। অতএব ঐশী জামা'ত তথা খোদার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মাঝেও কোন কোন অভাগা মুরতাদ হতে পারে একথা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত।

'আল্লামা'-র একটি আপত্তিহল, হযরত মির্যা সাহেব যাদের প্রশংসা করেছেন তারা কীভাবে মুরতাদ হতে পারে? পাঠকবৃন্দ ভালভাবেই জানেন, মহানবী(সা.) সহীহ হাদীসে বলেছেন,

إنما أصحابي كالنجوم ، فبأيهم اقتديتم اهتديتم

নিশ্চয় আমার সাহাবীরা তারকা সদৃশ, এদের যেকোন একজনের অনুসরণ করলেই তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে (ইবানাতুল কুবরা লি-ইবন্ বাত্তাহ)। যাদের এত প্রশংসা মহানবী(সা.) নিজে করেছেন তাদের কেউ কি কখনও মুরতাদ হয় নি?

একবার একজন আরব বেদুঈন মদীনায় এসে মুসলমান হবার পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে এটিকে ইসলাম গ্রহণের কুফল বলে মনে করে এবং প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে মহানবী(সা.)-এর চোখের সামনে মদীনা শরীফ ত্যাগ করে। রসূলুল্লাহ(সা.) তাকে যেতে বাধাও দেন নি অথবা তাকে

হত্যাযোগ্য অপরাধীও সাব্যস্ত করেন নি (বুখারী কিতাবুল হাজ্জ, বাব-আল মাদীনাতু তানফীল খুবুস)।

এবার নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন সাহাবীর ঘটনা। আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ কুরআনের ওহী সংরক্ষণের কাজে লিপিকারের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি কেবল ধর্মত্যাগ করে মুরতাদই হন নি বরং মদীনা ছেড়ে মক্কায় গিয়ে সশস্ত্র আগ্রাসীদের দলে যোগ দেন। মক্কা বিজয়ের দিন তাকে সাধারণ ক্ষমার আওতা বহির্ভূত রাখা হয়। পরবর্তীতে এই অপরাধী হযরত উসমান(রা.)-এর কাছে আশ্রয় নেয়। আর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাওয়ার কারণে এবং হযরত উসমানের সুপারিশে মহানবী(সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। কেবল তাই নয়, পরবর্তীতে এই 'সাবেক মুরতাদ' খলীফার পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নরের দায়িত্বও পালন করেন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত সীরাতুন নবী-ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৪ ও ৬৫)।

অতএব 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেবের আপত্তি ধোপে টিকল না। কে মানল আর কে মানল না, কে টিকল আর কে টিকল না সেদিক না তাকিয়ে বুদ্ধিমানরা দাবীদারের দাবী মনোযোগ দিয়ে শুনে কুরআন, সুন্নত ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী তা যাচাই করে সত্য-মিথ্যা পরখ করে। আহমদীরা তাই করেছে এবং এসবই আমাদের কষ্টিপাথর।

৩ নম্বরে উল্লিখিত শামসুদ্দীন মুরতাদ মিস্ত্রী হামিদুদ্দীন সাহেবের ছেলে। ২০০৩ সালে নৈতিক পদস্খলনের কারণে তাকে আহমদীয়া জামা'ত থেকে বের করে দেয়া হলে সে যোগাযোগ ছেড়ে দেয়।

অবশেষে ২০১৩ অর্থাৎ উক্ত বহিষ্কারের ১০ বছরের পর পাকিস্তানী মোল্লা-হুজুররা একে মসীহ মাওউদ(আ.)-এর খান্দানের সদস্য হিসেবে মিথ্যা প্রচারণা চালায়। যাকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনৈতিক কাজের জন্য বহু বছর বহিষ্কার করেছে আর যে কোথাও ঠাঁই না পেয়ে ধর্মব্যবসায়ী হুজুরদের কোলে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে গর্ব করা একজন হাক্কানী আলেমের পক্ষে সত্যিই শোভা পায় না।

আপত্তিঃ হাজার লানত প্রসঙ্গ

'আল্লামা' আব্দুল মজিদ সাহেবের একটি বড় আপত্তি হল, আহমদীরা একমুখে বলে Love for All Hatred for None অর্থাৎ ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে। কিন্তু বাস্তবে তাদের প্রতিষ্ঠাতা তার 'নূরুল হক' পুস্তকে শত্রুদের হাজারবার লানত করেছেন। অর্থাৎ আহমদীরা মুখে বলে ভালবাসা আর কার্যত করে অভিশাপ। এটি হল, 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের আপত্তি।

উত্তর: 'আল্লামা'ও তার সমমনারা একমুখে হযরত মুহাম্মদ(সা.)-কে রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের জন্য দয়া ও মূর্তিমান কৃপা বলে মানেন আর সেই মাওলানারাই আরেক মুখে ঘোষণা দেন মহানবী(সা.) তাঁর জীবনে ১৯টি সমর যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন। একদিকে রহমত হবার দাবী আর অপরদিকে যুদ্ধ ও রক্তক্ষরণ– স্ববিরোধ নয় কি? না, এটি মোটেও স্ববিরোধ নয়। ইসলামে তথা পবিত্র কুরআনে কোন স্ববিরোধ নেই। যদি কেউ এতে বাহ্যত স্ববিরোধ দেখে তবে এটি তার দেখার ও বুঝার ভুল।

রসূলুল্লাহ্(সা.) সামগ্রিকভাবে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাইকে ভালবেসেছেন এবং ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছেন। এ অর্থে তিনি 'রহমাতুল্লিল আলামীন'। কিন্তু যেখানে মানবতা বিপর্যস্ত, ধর্মীয় স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত আর জীবন ও সম্মান হুমকির সম্মুখীন সেখানে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধও করেছেন। এ দু'য়ের মাঝে কোন স্ববিরোধ নেই।

তেমনিভাবে ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে– এটাই আমাদের আদর্শ, নীতি ও শিক্ষা। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালবাসা ইসলাম-আহমদীয়াতের শিক্ষা। কিন্তু যদি আল্লাহ্, তাঁর প্রিয়তম নবী(সা.), ইসলাম এবং কুরআনের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে সেক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ অর্থাৎ দোয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হতে আমরা বাধ্য। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

নিশ্চয়ই আমরা যেসব নিদর্শনাবলী অবতীর্ণ করেছি তা মানুষের কাছে সুস্পষ্টভাবে এই কিতাবে বর্ণনা করার পরও যারা গোপন করে, এরাই এমন

লোক যাদেরকে আল্লাহ্ লা'নত করেন এবং তাদেরকে অভিশাপকারীও অভিশাপ করে (সূরা বাকারা: ১৬০)।

এ আয়াতের শিক্ষানুযায়ী যখন মির্যা সাহেব কপট ইসলামত্যাগী আলেম খ্রিস্টান পাদ্রীদের নির্লজ্জ আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছেন তখন তিনি প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণকারী সেসব আলেমরা হলেন, পাদ্রী ইমামুদ্দীন, মৌলভী করমুদ্দীন, মৌলভী এলাহী বখশ, মৌলভী হামীদুল্লা খান, মৌলভী নূরুদ্দীন, মৌলভী সৈয়দ আলী, মৌলভী আব্দুল্লাহ বেগ, মৌলভী হোসামুদ্দীন বোম্বে, মৌলভী হিসামুদ্দীন, মৌলভী কাজী সাবদার আলী, মৌলভী আব্দুর রহমান এবং মৌলভী হোসাইন আলী প্রমুখ জীবনের একটি বড় অংশ মুসলমান আলেম হিসাবে কাটানোর পর খ্রিস্টান হয়। এরপর মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাক্তন উপাধী তথা 'মৌলভী' ব্যবহার করে লেখালেখি করতে থাকে। যেন জনসাধারণ এদের লেখা পড়ে প্রভাবিত হয়। খ্রিস্টান হবার পরও 'মৌলভী' উপাধী ব্যবহার করে জনসাধারণকে এরা বুঝাতে চাইতেন, আমরা আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী এবং আমরা অনেক পড়াশোনা গবেষণা করে ইসলাম ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে দেখেছি। আর ইসলামের তুলনায় আমাদের কাছে খ্রিস্ট ধর্মের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত। তাই আমরা ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছি। 'মৌলভী' নাম ব্যবহার করে তারা জনসাধারনকে নিজেদের প্রভাব বলয়ে আনার চেষ্টা করেছে যেন তারা মনে করে এত বড় বড় আলেম যদি ইসলাম ত্যাগ করে থাকে সেক্ষেত্রে ইসলামে কোন ক্ষুত নিশ্চয়ই আছে। পাদ্রী ইমাদুদ্দীন 'তাওযীনুল আকওয়াল' নামে একটি পুস্তক রচনা করে। এতে সে দাম্ভিকতার সাথে দাবী করে, কুরআনের ভাষা ও রচনাশৈলি কেবল যে অর্থের গভীরতা ও বিস্তৃতির দিক থেকে (তথা ফাসাহাত ও বালাগাতে) দুর্বল তা-ই নয় বরং এর সাধারণ ভাষারীতিতেও অনেক ভুল রয়েছে। পাদ্রী ইমামুদ্দীন, যে আগ্রার জামে মসজিদের ইমাম ছিল এবং তার সমমনারা এমন ন্যাক্কারজনক প্রতারণার মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে কুরআনের বিপক্ষে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) ইসলামের সেনাপতি হিসেবে এসব ধর্মান্তরিত 'আলেম-উলামা'কে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। তিনি তার নূরুল হক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রাঞ্জল ও সাবলিল আরবী ভাষায় লেখেন, কুরআনের বিরুদ্ধে এমন সমালোচনার অধিকার কেবল তার আছে যে আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য রাখে। যে আরবী ভাষায় পারদর্শী নয় এবং এর সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে

অবগত নয় সে কীভাবে ও কোন মুখে কুরআনের সমালোচনা করতে পারে? অতএব আমি তোমাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, প্রথমে তোমাদের যোগ্যতা সাব্যস্ত কর আর এর একটি পন্থা হল, আমি আরবী ভাষায় **'নূরুল হক'** নামে যে পুস্তক রচনা করেছি এর প্রত্যুত্তরে তোমরাও আরবী ভাষায় একটি বই রচনা কর। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের পুস্তক আমার পুস্তিকার মত হুবহু এবং সমতুল্য হতে হবে তাহলে আমি তাকে নগদ পাচ হাজার রুপী পুরস্কার দিব। এক্ষেত্রে সে সরকারের মধ্যস্ততায় এ পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না আসে, তাহলে তারা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। আর আমি নিশ্চিত, তারা কখনই আসতে পারবে না।

এরপর এই শ্রেনির মিথ্যাবাদী, যারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে আলেম সেজে মানুষকে প্রতারিত করছে–তারা যদি পবিত্র কুরআন ও মহানবী(সা.)-কে গালমন্দ ও কটাক্ষ করার অভ্যাস পরিত্যাগ না করে আর বাজে কথা বলা আর অপমান করা বন্ধ না করে তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হাজার লা'নত। অতএব সকলের উচিত হবে এতে 'আমীন' বলা।

পাঠকবৃন্দ, সূরা বাকারার ১৬০ নম্বর আয়াতটি আরেকবার মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। এর পাশাপাশি তাদের আচরণ ও বৈশিষ্টাবলী লক্ষ্য করুন। এসব মৌলভীরা সত্য জেনেও গোপন করছিল, আরবী ভাষার পাণ্ডিত্য না থাকা সত্ত্বেও মানুষকে আল্লাহ্ ও কুরআন থেকে বিমুখ করছিল। এদের বিষয়ে আল্লাহ্ এবং তাঁর অধিনস্থ সবাই লানত করেন বলে বর্ণিত আছে। মির্যা সাহেব আল্লাহ্ প্রদর্শিত ঠিক সেই কাজটিই করেছেন। মানবজাতির প্রতি অগাধ ভালবাসাই তাঁকে এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে বাধ্য করেছে। এতে তারা পরাস্ত হলে মানবজাতি রক্ষা পাবে। এটাই হল, "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো 'পরে"-এর প্রকৃত বাস্তবায়ন।

সাধারণ আহমদী ও সাধারণ জনগণ না হয় আরবী উর্দূ জানেন না তাই এর প্রেক্ষাপট অবগত নন। কিন্তু 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ, তিনি তো আরবী উর্দূ ভাষা জানেন। তিনি তো এই পুরো পুস্তিকা পড়েই আপত্তির জন্য উদ্ধৃতি বের করেছেন। এসব জানা সত্ত্বেও 'আল্লামা'র এমন আপত্তি উত্থাপন প্রতারণা নয় কি? আগে দেখেছি, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য ব্যবহারে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদের গা জ্বলে। এখন দেখছি ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যারা

ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তাদেরকে ‘আল্লাহ্ নির্দেশিত লা’নত’ করাও তিনি সহ্য করতে পারেন না! কিয়ামতের দিন ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ যে কাদের সংসর্গ লাভ করবেন সেটাই এখন দেখার বিষয়। সঙ্গী হিসাবে মুহাম্মদ(সা.) ও কুরআন বিদ্বেষীরা কত মন্দ। আল্লাহ্‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদকে হেদায়াত দিন।

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ সাহেবের কাছে আরেকটি প্রশ্ন, যারা খ্রিস্টান হয়ে পূর্ববর্তী মুসলিম উপাধি ব্যবহার করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে রসূল(সা.)-এর পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনএবং কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে আবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে নিজেদের ধৃষ্টতায় অনড় থেকেছে– এসব প্রতারক খ্রিস্টানদেরলা’নত না করেতাদেরসাথে কি প্রেমালাপ করা উচিত ছিল?

কিন্তু ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ তো এসব কিছুই জানেন। তিনি তো আরবী ও উর্দূ ভাষাজ্ঞান রাখেন আর তিনি মির্যা সাহেবের এই পুস্তকটি পড়েই আপত্তি তুলেছেন। তিনি কেন এক প্রতারক খ্রিস্টানকে লানত করায় এতটা মনোকষ্ট পেলেন! মহানবী(সা.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের বিপরীতে সকল মুসলমানকে এক সারিতে দাঁড়ানো উচিত। আল্লামা নিশ্চয় এই শিক্ষা সম্পর্কেও জানেন। পবিত্র কুরআনে রাউফুর রাহীম আল্লাহ্ তা’লা বলেন,

كَيْفَ يَهْدِي اللَّـهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّـهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿0﴾أُولَـٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّـهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿0﴾

অর্থাৎ কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়ে গেছে। আর আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করেন না। এমন লোকের শাস্তি হল আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেরই লানত তাদের প্রতি বর্ষিত হয় (সূরা আলে ইমরান: ৮৬ ও ৮৭)।

এ পর্যায়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি দেখে নিন। এই উদ্ধৃতি থেকে বুঝে যাবেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কী ধরনের রসূলপ্রেম হৃদয়ে লালন করে ইসলাম বিদ্বেষীদের মোকাবেলা করেছেন। হযরত মির্যা সাহেব বলেন:

“আমার ধর্মমত হল, হযরত রসূলুল্লাহ(সা.)-কে পৃথক করে এ পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত নবী একত্রিত হয়েও যদি সেই দায়িত্ব ও সংশোধনের কাজ সম্পাদন করতে চাইতেন যা মহানবী(সা.) সম্পাদন করে গেছেন, তাহলে তারা তা কখনই করতে পারতেন না। তাদেরকে সে অন্তর আর সে শক্তিই প্রদান করা হয়নি যা আমাদের নবী(সা.)-কে প্রদান করা হয়েছিল। এ কথায় কেউ যদি নবীদের বে-আদবী মনে করে তবে সেই অজ্ঞের পক্ষ থেকে তা হবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা। **আমি সমস্ত নবীদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করা আমার ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করি।** কিন্তু সকল নবীর ওপর হযরত নবী করীম(সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব হল আমার ঈমানের সবচাইতে বড় অঙ্গ, আর এ বিশ্বাস আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে। এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা আমার সাধ্যের বাইরে। দুর্ভাগা আর দৃষ্টি শক্তি বঞ্চিত বিরোধী যা ইচ্ছা বলুক। কিন্তু আমাদের নবী করীম(সা.) যে কাজ সম্পাদন করে গেছেন তা পৃথক পৃথকভাবে কিম্বা সম্মিলিতভাবে অন্য কারও দ্বারা সম্পাদিত হতে পারত না। আর এটি আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহ বিশেষ। **যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহি মাইয়্যাশাউ**। (মলফুযাত প্রথম খণ্ড, ৪২০)

‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদের প্রতি নিবেদন মুহাম্মদ(সা.)-এর বিরুদ্ধবাদীদের অনুরাগী না হয়ে মুহাম্মদ(সা.)-এর অনুরাগী হবার চেষ্টা করুন। ইশ্বরপুত্র যীশুর প্রেমিকদের ভক্ত না হয়ে মুহাম্মদ(সা.)এর প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত হন। কেননা মুহাম্মদ(সা.)-এর অনুরাগই এখন আল্লাহর ভালবাসা লাভের একমাত্র পথ। বুদ্ধিমান পাঠকদের কাছে অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে গেছে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)-এর প্রতিক্রিয়া হুবহু তা-ই যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা শিখিয়েছেন।

পাঠক! সবশেষে বলতে চাই, ‘আল্লামা’ আব্দুল মজিদ ও তার সমমনারা এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত উভয় পক্ষই প্রতিশ্রুত ভবিষ্যদ্বাণীতে একমত। সবাই বিশ্বাস করে, মহানবী(সা.) প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে ইসলামের সেবার জন্য ঈসা ইবনে মরিয়ম নবীউল্লাহ্ আবির্ভূত হবেন। শুধুমাত্র এই ঈসা নবীউল্লাহ্ নির্বাচনে আমাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আর এর সহজ সমাধান হল, হযরত ঈসা(আ.)-এর জীবন মৃত্যুর বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া।।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যদি বনী ইসরাঈলী নবী ঈসা ইবনে মরিয়ম জীবিত প্রমাণিত হন তাহলে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ এবং তার সমমনারা সঠিক আর আহমদীয়া জামা'ত বেঠিক। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী যদিহযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম মৃত সাব্যস্ত হন তাহলে 'আল্লামা' আব্দুল মজিদ এবং তার সমমনারা বেঠিক আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সঠিক।

'আল্লামা' যদি আহমদী বন্ধুদের আহমদীয়াত থেকে বিচ্যুতই করতে চান তাহলে তার উচিত ছিল পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের জীবিত থাকার প্রমাণ জনসমক্ষে উপস্থাপন করা কিন্তু পরিতাপ তিনি এই সহজ ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিটি অবলম্বন না করে অন্যের মিথ্যা ছিদ্রান্বেষণের পথ বেছে নিয়েছেন। অন্যের মিথ্যা ছিদ্রান্বেষণ না করে আমাদের উচিত প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাসের সপক্ষে অকাট্য দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা।

যারা হেদায়েতের অনুসন্ধান করে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আমীন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব বলেছেন মহানবী (সা.)-এর ১২ জন কন্যাসন্তান ছিল!

উত্তর:মূল উদ্বৃতিটি হল, "দেখ, আমাদের নবীর ঘরে ১২ মেয়ের জন্ম হয়েছে।" (মলফূযাত, ৩য় খ , পৃ. ৩৭২)

প্রথম কথা হলো, এটি মলফূযাত ৩য় খন্ড হতে নেয়া হয়েছে। পাঠকের জানা উচিত মলফূযাত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর নিজের লেখা কোন গ্রন্থ নয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর কথা ও বক্তব্য শুনে সাহাবীগণ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার সংকলন।

উক্ত বর্ণনা যেই সাহাবী লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি এই বক্তব্য তুলে ধরার শুর তে (পৃষ্ঠা ৩৬৯) নিজে উল্লেখ করছেন, মহিলাদেরকে এই নসিহত তিনি তার বাড়িতে করছিলেন আর বাহির থেকে সাহাবী সেটি নোট করছিলেন। আর এই বর্ণনার শুর তে বর্ণনাকারী নিজে লিখছেন, "যেহেতু বাচ্চারাও মহিলাদের সাথে ছিল তাদের হৈচৈ এর কারণে প্রায়শই বক্তব্য শুনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই যথাসাধ্য এটি নোট করা হয়েছে।" বর্ণনাকারী নিজে এখানে ভুল হবার আশঙ্কা প্রকাশ করছেন।

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আলেম-উলামা মাত্রই আসমাউর রিজাল-এর নীতি সম্পর্কে জ্ঞাত। অতএব যে বর্ণনায় বর্ণনাকারী নিজেই নিশ্চিত নয় এমন বর্ণনা থেকে আপত্তি উত্থাপন করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। আর কোন আলেম এতে আপত্তি করতে পারে না।

আপত্তি : ঈসা (আ.)-এর কবর বিভিন্ন স্থানে।

উত্তর: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ‘একথা সত্য, মসীহ তার দেশ গেলিলে গিয়ে মারা গেছেন।’ (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন ৩য় খ-, পৃষ্ঠা ৩৫৩)

আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) বলেছেন, ‘এরপর মসীহ সেই স্থান থেকে সংগোপনে পালিয়ে কাশ্মিরের দিকে এসে গেছেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন আর তোমরা শুনেছ, শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর আছে।’ (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন ১৯শ খ- পৃষ্ঠা ৩৫৩)

যদি ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে পূর্বাপর পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) এই উদ্ধৃতিতে খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের আলোকে হযরত মসীহ্ও তিন দিন জীবিত থাকার বিষয়টি উলে-খ করছেন যে তিন দিন পর খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুযায়ী যিশু খোদার ডান পাশে গিয়ে বসেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ(আ.) ইযালায়ে আওহামে ‘২৩ এপ্রিল প্রকাশিত আখবার নূর আফশাঁর আপত্তি’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নূর আফসাঁ পত্রিকায় হযরত মসীহর আকাশে চলে যাবার দলীল দেয়া হয়েছিল, ১১জন হাওয়ারী স্বচক্ষে তাঁকে আকাশে চলে যেতে দেখেছে। এর প্রেক্ষিতে হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ(আ.) লেখেন,

‘এখন পাদ্রি সাহেব শুধু একথাতেই সন্তুষ্ট হয়ে ভেবে নিয়েছেন যে, হযরত মসীহকে এই নশ্বর দেহ সহই তাঁর মৃত্যুর পর আকাশে দিকে উঠানো হয়েছে। কিন্তু তারা জানে এই বর্ণনা লুকা কর্তৃক বর্ণিত যিনি হযরত মসীহকে দেখা তো দূরের কথা তার শাগরেদদের কাছ থেকেও কিছু শুনেন নি। এক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির বর্ণনা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে যেখানে কোন চাক্ষুষ সাক্ষির নাম উদ্ধৃত নেই। এসব বর্ণনা বিভিন্ন ভুল ধারণায় ভরপুর। এটা ঠিক, মসীহ নিজের

দেশ গেলিলে মারা গেছেন কিন্তু যে দেহ দাফন করা হয়েছিল সেই দেহ নিয়েই তিনি জীবিত হয়ে গেছেন তা নয় বরং সেই অধ্যায়ের ৩ আয়াত স্পষ্ট করছে মৃত্যুর কাশফীভাবে ৪০দিন পর্যন্ত মসীহ তার শাগরেদদের দেখা দিয়েছেন। এস্থলে কেউ এটি মনে করবেন না, মসীহ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন কেননা আমি প্রমাণ করেছি, খোদা তালা মসীহর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। বরং প্রথম অধ্যায়ের ৩ আয়াত মসীহর স্বাভাবিক মৃত্যুর বিষয়ে সাক্ষ দিচ্ছে যা গালীলে সংঘটিত হয়েছে।... মনে রাখবে এসব বিশে-ষণ এমন অবস্থায় যখন আমরা এসব উদ্ধৃতিকে সঠিক ও হস্তক্ষেপের উর্ধে মেনে নিই কিন্তু এসব উদ্ধৃতি মেনে নেয়া দুঃষ্কর বিষয়।"(ইযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন ৩য় খ-, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৬)

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, হযরত মির্যা সাহেব যে কবরকে গালীলে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন তা বাইবেলের আলোকে এবং খ্রিস্টানদের আকীদা থেকে বলেছেন যে কবরে হযরত মসীহ ক্রুশ বিদ্ধ হবার পর ছিলেন। এই কবরটি একটি কক্ষের ন্যায় ছিল খ্রিস্টানরা আজও এর উপাসনা করে।

হযরত মির্যা সাহেব উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট বলেছেন, 'এস্থলে কেউ এটি মনে করবেন না, মসীহ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন কেননা আমি প্রমাণ করেছি, খোদা তালা মসীহর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।' এরপর তিনি শেষে বলছেন, 'মনে রাখবে এসব বিশ্লেষণ এমন অবস্থায় যখন আমরা এসব উদ্ধৃতিকে সঠিক ও হস্তক্ষেপের উর্ধ্বে ধরে নিই কিন্তু এসব উদ্ধৃতি মেনে নেয়া দুঃষ্কর বিষয়।' এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) গালীল বা বিলাদে শামের কবরকে জীবিত দাফনের কবরই বলেছেন। হযরত মির্যা সাহেব রূহানী খাযায়েন ১০ম খ-, সাত্ বচন পুস্ড়কের ৩০৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন, 'হ্যা, আমি কোন এক পুস্তকে এটিও লেখেছিলাম, হযরত মসীহর কবর বিলাদে শামে কিন্তু এখন সঠিক গবেষণা আমাদেরকে এ বিষয়টি লিখতে বাধ্য করছে, প্রকৃত কবর কাশ্মীরেই আছে এবং বিলাদে শামের কবর হল যেখানে তাকে জীবিত দাফন করা হয়েছিল এবং তিনি তা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।"

অতএব, মির্যা সাহেব পূর্বে কোন পুস্তকে গালীল বা বিলাদে শামে মসীহর কবর আছে বলে বলে থাকলেও তার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী কাশ্মীরের খানইয়ার মহল্লার কবরই প্রকৃত কবর আর গালীল বা বিলাদে শামের কবরটিতে হযরত

মসীহ(আ.)-কে আহত অবস্থায় মৃত ভেবে দাফন করা হয়েছিল। অতএব স্পষ্ট করে বলে দেয়ার পর এতে আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

আপত্তিঃ ‘মুহাম্মদ আবার আমাদের মাঝে এসেছে, মর্যাদায় আগের চেয়ে সামনে বেড়ে পূর্ণাঙ্গীন মুহাম্মদকে যদি কেউ দেখতে চাও কাদিয়ানে এসে গোলাম আহমদকে দেখে যাও।’

উত্তর: আকমল নামের এক ব্যক্তির একটি কবিতার একটি লাইনে এ কথা রয়েছে। এ বক্তব্য মির্যা সাহেবের নয়, আহমদীয়া জামাতের কোন খলীফারও নয়। অতএব এই অভিযোগটি আহমদীয়া জামা’তের বির‍ুদ্ধে আরোপিত হতে পারে না। এরপরও এই কবিতাংশটি যখন আহমদীয়া জামা’তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর‍ুদ্দীন মাহমুদ (রা.)–এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তিনি উত্তরে বলেন, ‘যদি এতে উন্নত মর্যাদা বুঝানো হয়ে থাকে তাহলে এমন বিশ্বাস নিঃসন্দেহে কুফরী।’ এরপর স্পষ্ট করে বলেছেন, যে অর্থেই এমন শব্দ ব্যবহার করা হোক না কেন ‘এটি চরম অপছন্দনীয় ও বে-আদবী’ (আলফজল, ১৯ আগস্ট ১৯৩৪)। যারা এত ঘাটাঘাটি করে আপত্তি করার সুযোগ খুঁজে বের করছে তারা কি এর প্রতিক্রিয়া দেখে নি। নিশ্চয়ই দেখেছে! কিন্তু সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য এবং সামাজিক অশান্ড়ি ও নৈরাজ্য ছড়ানোর উদ্দেশ্যে আপত্তিকারীরা এমন ভিত্তিহীন আপত্তি করে যাচ্ছে।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব শরীয়তবাহী নবী হবার দাবী করেছেন (রুহানী খাযায়েন ১৭, ৪৩৫ পৃষ্ঠা)

জবাবঃ এটি জঘন্য একটি অপবাদ। তিনি কোথাও এ কথা বলেননি। তিনি তার জীবনের শেষের দিকে এসে বলেছেন,

”এই অপবাদ যা আমার উপর আরোপ করা হয় যে, আমি নিজেকে এমন নবী মনে করি যে, কুরআন করীমের অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই আর আমি পৃথক কলেমা ও পৃথক কিবলা বানাই এবং ইসলামি শরীয়তকে মনসুখ করে দেই। আমার উপর এই অপবাদ সঠিক নয়। বরং এমন দাবী আমার নিকট কুফরী। আর শুধু আজই নয়, বরং সর্বদা আমি আমার

পুস্তকে এটিই লিখছি যে, এ ধরণের নবুয়্যতের কোন দাবী আমার নেই আর এটি একেবারে আমার প্রতি অপবাদ আরোপ।" (আখবারে আ'ম ২৬মে ১৯০৮)

সুতরাং যে উদ্বৃতি আপনার দিয়ে থাকেন সেখানে মসীহ মওউদ (আ.) কখনও এটি বলেননি যে, আমি শরীয়তবাহী নবী। তিনি তো বিরুদ্ধবাদীদের দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে লাও তাকাব্বালা শব্দের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এ কথা বলেছেন যে, যদি বল- লাও তাকাব্বালা শব্দটি ২৩বছরের মানদন্ড শরীয়তবাহী নবী সম্পর্কে তাহলে এটি অযৌক্তিক।

এরপর তিনি আপত্তিকারীকে জবাব দিতে গিয়ে বলেন, শরীয়তবাহী বলতে তোমরা কি বুঝ? ঐদি বল শরীয়তবাহী বলতে তাকে বুঝানো হয় যার ওহীতে আদেশ নিষেধ নিহিত থাকে, তাহলে সেই সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের বিরোধীরা অভিযুক্ত । কেননা আমার ওহীতেও আদেশ-নিষেধ রয়েছে।"

এখানে মির্যা সাহেব শুধু যুক্তির খাতিরে এই সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধীদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি এখানে কখনই নিজেকে শরীয়তবাহী নবীর মাঝে সংজ্ঞায়িত করেননি। এরপর মসীহ মওউদ (আ.) একটু সামনে গিয়ে তার একটি ওহী পেশ করেন যা সূরা নূরের ৩১ নাম্বার আয়াতের অনুরুপ।

এটি কুরআন মজিদের আয়াত আর মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর তাজদীদ (সংস্কারমূলকভাবে) অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং মসীহ মওউদ (আ.) এর উপর ওহী কুরআনের শরীয়তকে তাজদীদ রুপে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে। স্থায়ীভাবে তার উপর নতুন কোন আদেশ নিষেধ অবতীর্ণ হয়নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐ পৃষ্ঠার টিকায় এ কথাই লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'লা আমার ওহীতে আদেশ ও নিষেধ সংস্কারমূলকভাবে অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল শরীয়তবাহী নবী তাকে বলা হয় যার কাছে নতুন আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হয় যা পূর্ববর্তী শরীয়তকে রহিত করে।

কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ওহীতে আদৌ এমনটি ঘটেনি। সুতরাং মির্যা সাহেবের প্রতি এই আপত্তি করা যে, তিনি শরীয়তবাহী নবীর দাবী করেছেন ডাহা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা অপবাদ।

আপত্তিঃ দাজ্জাল সম্পর্কে মির্যা সাহেবের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে-

১। মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধবাদী আলেমরা দাজ্জাল। (ফতেহ্ ইসলাম)

২। উন্নত জাতিগুলো দাজ্জাল, রেল তাদের গাধা। (ইযালায়ে আউহাম ১৩৪ পৃষ্ঠা)

৩। পাদ্রীরা দাজ্জাল (ইযালায়ে আওহাম ১৫৯ পৃষ্ঠা)

৪। ইবনে সায়্যাদ দাজ্জাল (ইযালায়ে আওহাম) চারটি কথাই পরস্পর বিরোধি।

জবাবঃ এখানে পুরোপুরি প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ফতেহ ইসলামের পুরো পুস্ড়কে কোথাও হুযুর (আ.) বির"দ্ধবাদী আলেমদের দাজ্জাল বলেননি। ২ ও ৩ নম্বরে উন্নত জাতি ও পাদ্রীদের কথা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও হুযুর (আ.) ইযালায়ে আওহামে উন্নত জাতি বলতে পাদ্রীদের দলই বুঝিয়েছেন। মোটকথা আপত্তি কারকরা প্রথমে ভূল বর্ণনা, পরে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন।

দাজ্জালের অর্থ ধোঁকাবাজ এবং বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টিকারী। যেভাবে হুজাজুল কেরামা পৃষ্ঠা ৪০১-এ লিখা আছে, “মুবালাগার সীগা অনুযায়ী দাজ্জালের অর্থ সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধোঁকাবাজ এবং বিভ্রান্ড়ি সৃষ্টিকারী।”

হুযুর (আ.) লিখেছেন- “অভিধানে দাজ্জালের অর্থ মিথ্যাবাদীর দলকে বোঝায় যারা মিথ্যাকে সত্যের সাথে সংমিশ্রণ করে এবং আল-াহর সৃষ্টিকে বিপদগামী করার জন্য ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্ড়িকে কাজে লাগায়।” (ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ২০৪)

আরও একটি কথা আমাদের আলেমদের জন্য মনোযোগের বিষয়। আর তা হল হাদিসে শুধুমাত্র একটি দাজ্জালের উলে-খ নেই, বরং অনেক দাজ্জালের উলে-খ রয়েছে। (ইযালায়ে আওহাম, পৃষ্ঠা ৬২)

হুযুর (আ.) প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হিসেবে পাদ্রীদের দলকে সাব্যস্ড় করেছেন এবং শুধুমাত্র ইবনে সায়্যাদ-কে দাজ্জাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যার কারণে কোন আপত্তি থাকে না। যের"পভাবে হুযুর (আ.) বলেন,

"দাজ্জাল অনেক গত হয়েছে এবং সামনেও অনেক দাজ্জাল হবে, কিন্তু সেই মহা দাজ্জাল যার দাজ্জাল হওয়া আল-াহর কাছে এতই অপছন্দের যে এতে আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এই দল এক মুষ্টি মাটিকে খোদা আখ্যাদানকারী হবে। আল-াহ কুরআন করীমে ইহুদী, মুশরিক এবং অন্যান্য জাতির বিভিন্ন ধোকাবাজির কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই বড়ত্ব কোন দাজ্জালকেই দেননি যে এর কারণে আকাশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং যে দলকে আল-াহ তা'লা কুরআন পাকে মহা দাজ্জাল আখ্যা দিয়েছেন- তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে মহা দাজ্জাল আখ্যা দেয়া উচিত নয়।" (আনজামে আথম, পৃষ্ঠা ৪২)

ইবনে সিয়্যাদ তার প্রথম দিনগুলোতে নিশ্চিত ভাবে দাজ্জাল ছিল। এবং কতিপয় শয়তানের ব্যাপারে তার থেকে অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ পায়। (ইযালায়ে আওহাম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৫)

আপত্তি ঃ হযরত মসিহ মওউদ (আ.) তার কিতাব ইযালায়ে আওহামে মুহাদ্দাস হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন এবং নবী হওয়া অস্বীকার করেছেন এবং "এক গালাতি কা ইযালায়" নবুয়তের দাবি করেছেন এবং মুহাদ্দাস হওয়া কে অস্বীকার করেছেন। অতএব তার নিজের কথা অনুযায়ী তিনি মুহাদ্দাসও নন নবী ও নন।

জবাবঃ এই দুইটি বিষয়ই তার (আ.) উদ্ধৃতি থেকে ভুলভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে হুযুর (আ.) নিজে বলেছেন যে, যে যে স্থানে আমি নবুয়্যত বা রিসালাতের অস্বীকার করেছি তা শুধুমাত্র এই অর্থে যে, আমি স্বতন্ত্রভাবে শরীয়ত আনয়ণকারী নবী নই। কিন্তু আমি এই অর্থে নবী যে, আমি আমার অনুসরণীয় রসূল থেকে কল্যাণ লাভ করে এবং নিজের জন্য তার নাম পেয়ে তার মাধ্যমে খোদার নিকট থেকে অদৃশ্যের জ্ঞান পেয়ে আমি নবী ও রসূল। কিন্তু নতুন কোন শরীয়ত আনয়ন ছাড়া। এইরূপ নবী বলা হতে আমি কখনো অস্বীকার করিনি। বরং এই অর্থেই আল-াহ তা'লা আমাকে নবী ও রসূল বলে সম্বোধন করেছেন। (এক গালাতি কা ইযালা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬)

এই উদ্ধৃতিতে তিনি স্বতন্ত্র ও শরীয়তবাহক নবুয়্যতের অস্বীকার করেছেন এবং যিলি- ও শরীয়তবিহীন নবুয়্যতের স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোন প্রকার মতবিরোধ ও স্ববিরোধ নেই। যে উদ্ধৃতির উপরে আপত্তি করা হয় তার আসল উদ্ধৃতি এই যে, "যদি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তগণের নাম নবী রাখা না হয় তা হলে বলুন তাকে আর কি নামে ডাকা হবে। যদি বলা হয় তার নাম মুহাদ্দাস রাখা উচিত তা হলে আমি বলি যে, হাদিসে বর্ণিত তাহদিসের অর্থ কোন অভিধানেই অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। এই উদ্ধৃতি থেকে কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি নবী হয় সে মুহাদ্দাস নয়? এর অর্থ তো এটাই যে খোদা সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তদের নাম শুধুমাত্র মুহাদ্দাস রাখতে পারেন না। কেননা খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ প্রাপ্তদের নাম নবী রাখার মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এটা নয় যে, এখানে মুহাদ্দাসিয়াতের অস্বীকার করা হয়েছে। কোন স্থান কি এমন রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, আমি মুহাদ্দাস নই?"

হুযুর (আ.) এর বারাহীনে আহমদীয়া থেকে নিয়ে তার মৃত্যু পর্যন্ড় এই দাবিই ছিল যে, খোদা তা'লা আমার সাথে অধিক হারে কথা বলেছেন এবং সম্বোধন করেছেন এবং অদৃশ্যের সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করেছেন। প্রথম দিকে তিনি (আ.) তার নাম মুহাদ্দাসিয়াত দিতেন। কেননা তার

কাছেও অন্যদের মত নবীর জন্য নতুন শরীয়ত আনা বা স্বতন্ত্র নবী হওয়া জরুরি ছিল। সুতরাং তিনি তার লেখনীতে বলেছেন, "ইসলামী পরিভাষায় নবী এবং রসূলের এই অর্থ হয়ে থাকে যে, তিনি কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন অথবা পূর্ববর্তী শরীয়তের কিছু নির্দেশকে রহিত করে দেন, অথবা নিজেকে পূর্ববর্তী নবীর উম্মত বলেন না এবং কোন নবীর সাহায্য বা কল্যাণ ছাড়াই আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখেন।" (আল হাকাম, ৩য় খন্ড, সংখ্যা ২৯, ১৮৯৯ ইং)

কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লা তার (আ.) উপর এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন যে, কোন শরীয়ত নিয়ে আসা বা নিজে স্বতন্ত্র হওয়া কোন শর্ত নয়, তখন তিনি (আ.) বলেন,

১. "নবীর অর্থ এটি যে, খোদার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্ত হবেন এবং ঐশী মুকালেমা ও মুখাতেবার কল্যাণে কল্যাণ মন্ডিত হবে। শরীয়ত আনায়ন করা তার জন্য আবশ্যক নয়। আর কোন শরীয়তওয়ালা নবীর অনুসারী না হওয়াও আবশ্যক নয়।" (বারাহীনে আহমদিয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮)

২. "পূর্বে আমার এটি বিশ্বাস ছিল যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মের সাথে আমার কি সম্পর্ক? তিনি একজন নবী এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত বুযুর্গ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত এবং যদি কোন বিষয় আমার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রকাশ করা হত তা হলে আমি সেটিকে আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব মনে করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে খোদা তা'লার ওহী বৃষ্টির ন্যায় আমার উপর নাযিল হয়। তখন তিনি আমাকে এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিলেন না এবং স্পষ্টভাবে আমাকে নবী উপাধি দিলেন। কিন্তু এভাবে যে, এক দিক থেকে নবী আর এক দিক থেকে উম্মতি।" (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০)

৩. "এখন শুধুমাত্র মুহাম্মদী নবুয়ত ছাড়া সকল নবুওয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। কোন শরীয়ত বাহক নবী আসতে পারবে না। এবং শরীয়তবিহীন নবী হতে পারবে, কিন্তু সেই পারবে যে প্রথমে উম্মতী হবে। এই দিক থেকে আমি উম্মতীও এবং নবীও। (তাজালি-য়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা ২৫)

আপত্তিঃ আব্দুল হাকীম সাহেবের তফসীর সম্পর্কে তিন ধরণের কথা পরস্পর বিরোধী। মির্যা সাহেব ডাক্তার আব্দুল হাকিম সাহেবের তফসীর সম্পর্কে প্রথম দিকে বলেছেন, "অত্যন্ত উত্তম, সুমধুর বর্ণনা, এবং এতে কুরআন করিমের তত্ত্বজ্ঞানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, হৃদয় নিংড়ানো বর্ণনা এবং হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী তফসীর তিনি লিখেছেন।"

পরের দিকে, বদর পত্রিকা ৭ জুন, ১৯০৬ সালের সংখ্যায় মির্যা সাহেব লিখেছেন, "ডাক্তার আব্দুল হাকিম খানের মধ্যে যদি তাকওয়া থাকতো তাহলে তিনি কখনো তফসির লিখতেন না এবং লেখার নামও নিতেন না। কেননা তিনি তফসির লেখার যোগ্য নন। তার তফসিরে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্র নেই এবং না তার এই বিষয়ে বাহ্যিক কোন জ্ঞান রয়েছে।

মির্যা সাহেব এটাও লিখেছেন যে, আমি তার তফসির কখনো পড়িনি।

প্রশ্ন হল, যদি তিনি তার তফসির কখনো নাই পড়ে থাকেন তা হলে তিনি কিভাবে আব্দুল হাকিমের তফসির সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি রায় দিলেন?

জবাবঃ নিঃসন্দেহে তিনি (আ). এই তফসির পড়েননি এবং তা মুদ্রণের পর আর দেখেনও নি। হুযুর (আ.) এই তফসির শুনেছিলেন, অথবা কিছু কিছু অংশ শুনেছিলেন। যেভাবে, উপরে বর্ণিত ডাক্তার, হযরত মওলানা নূর‍ুদ্দীন সাহেব, খলিফাতুল মসীহ আল আউয়াল (রা.)-কে তার একটি চিঠিতে লিখেন,

"যে সময়গুলোতে আমি মির্যা সাহেবকে কুরআনের তফসির শুনাতাম, আপনারও এ কথা মনে থাকবে যে, সমস্ড় তফসিরের কোন এক স্থানেও মির্যা সাহেব না কোন সংশোধন করেছিলেন এবং না কোন সূক্ষ্ম তত্বজ্ঞানের কথা বলেছেন। তিনি অর্থাৎ মির্যা সাহেব নিঃসন্দেহে কিছু কিছু ভুল সংশোধন করেছিলেন এবং কিছু নতুন নতুন সূক্ষ্ম বিষয়ও বলেছিলেন।" (যিকর‍ুল হাকীম, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৩)

অতএব স্পষ্ট যে, হুযুর (আ.) এই তফসির শুনেছিলেন, সুতরাং তিনি রায় দিতেই পারেন। এখন বাকি থাকে এটা যে, এই বিষয়ে রায় দুটি ভিন্ন কেন? এটার উত্তর এই যে, "অতি উত্তম" এবং "সুমিষ্ট বর্ণনা" এই

শব্দদ্বয় যে তিনি ব্যবহার করেছেন এরূপ কোন উদ্ধৃতি কোথাও পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার আব্দুল হাকিম খান মুরতাদ হওয়ার পর তার নিজের পত্রিকা "যিকরুল হাকিম" খন্ড ৪ পৃ ৫৩-তে নিজের পক্ষ থেকেই এই শব্দ সংযুক্ত করেছিলেন আর কোন সনদ, উদ্ধৃতি বা কোন বর্ণনা এর স্বপক্ষে বলা যায় না।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ঈমান আনার পর মুরতাদ হওয়ার কারণে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। যেরূপ, কোন ব্যক্তি আজ মুমিন আছে, তার সম্পর্কে আমাদের ধারণাও তেমনই থাকবে, কাল সে যখন কাফের হয়ে যায় তখন তার পরিবর্তনের ফলে আমাদের ধারণাও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেভাবে, বাল'আম'এর উপর এক সময় ঐশী ইলহাম নাযিল হত, কিন্তু সে যখন মুসা (আ.) এর বির"দ্ধে দাঁড়ায় তখন তাকে আল-াহ তা'লার দরবার থেকে বিতাড়িত করা হয়।

যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার তফসিরের প্রশংসা করেন, এর পরের দুটি রায় সম্পর্কে ডা. হাকিম নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন,

প্রথম অবস্থাঃ "আমি হুজুরের স্বপক্ষে যে কাজটি করেছি সেটা হল, আমি প্রায় ছয় হাজার রুপি ব্যয় করে কুরআনের তফসির উর্দু এবং ইংরেজীতে প্রকাশ করি যেটাতে "মসীহ মওউদ" সম্পর্কিত সকল সমর্থনমূলক বিষয় যা বিভিন্ন বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রয়োজন এবং সুযোগ মত সংযুক্ত করা হয়েছে। আমার মতে ইসলামের খেদমত করার এটাই উত্তম পন্থা যে, কুরআন মজীদের সাথে সাথে সুবিধানুযায়ী তা উপস্থাপন করা হোক্.মানুষ আমাকে এটাও নসিহত করেছে যে এবং অসংখ্য পরিমাণ চিঠিও এসেছে যে, যদি এটা থেকে মির্জা সাহেবের স্বপক্ষে যে বিষয়াবলী রয়েছে তা বাদ দিয়ে দেয়া হয় তা হলে এই তফসিরের প্রকাশনা হাজার সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে। বরং কিছু কিছু মুসলমান আলেম এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য জীবন উৎসর্গ করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমি আল-াহর উপর ভরসা করে সেই সমস্ড় কথা উপেক্ষা করি এবং বেঈমানিমূলক কোন কথা বলিনি।" (যিকরুল হাকীম, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩)

দ্বিতীয় অবস্থাঃ "আমি এই তারিখ থেকে আমার বয়াত ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমার তফসির এবং 'তাযকেরাতুল কুরআন' পুস্তকে যে বিষয় মির্যা সাহেবের সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে সন্দেহযুক্ত জ্ঞান করি। যদি মির্যা সাহেব তার বর্তমান বাড়াবাড়ির সংশোধন না করেন এবং তওবা না করেন তা হলে ভবিষ্যতে আমি সেই সমস্ত বিষয়াবলী যা আমি মির্যা সাহেবের স্বপক্ষে লিখেছিলাম তা আমার তফসির থেকে বাদ দিয়ে দিব। (যিকরুল হাকীম, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৯)

দেখুন, এক সময় আব্দুল হাকিম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে তার সম্পর্ককে তফসিরে অন্তর্ভুক্ত করে সেটাকে "ইসলামের খেদমত" আখ্যায়িত করেছেন। এরপর নিজেই সেটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। অতএব এটাকে বিরোধপূর্ণ বর্ণনা এবং বিরোধী বলা প্রকাশ্য ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়।

আপত্তিঃ হযরত মির্যা সাহেব খোদা তা'লার পিতা হবার দাবী করেছেন যেমনটি তিনি বলেছেন, أنت منی و انا منک তুমি আমা হতে আর আমি তোমা হতে। এবং

و مظہر الحق والعلاء و كان الله نزل من السماء সত্য ও অতীব উচ্চ প্রভূর প্রকাশস্থল যেন আল্লাহ আকাশ হতে অবতরণ করেছেন।

জবাব : প্রথম কথা হল أنت منی و انا منک সম্পর্কে এতটুকু বলা যথেষ্ট আপত্তিকারী কুরআন মজীদ পড়েইনি এবং এর ব্যাপারে চিন্তাও করেনি। আরবী ভাষায় মিনকার অর্থ কখনই এরুপ হয় না যে, যেখানেই এ শব্দ আসে পিতা পুত্রের সম্পর্কেই আসে। যেরুপভাবে আল-াহ তা'লা বলেন, হযরত তা'লুত বলেছেন,

فمن شرب منہ فلیس منی و من لم یطعمہ فانہ منی -

অর্থ: যে এই নদী থেকে পরিতৃপ্তভাবে পান করবে সে আমার মধ্য হতে নয় আর যে পান করবে না সে আমার মধ্য হতে।

তাহলে এর মাধ্যমে কি এটি বুঝা যায় যে, যে পানি পান করবে সে আমার পুত্র থাকবে না আর যে পানি পান করবে না সে আমার পুত্র হয়ে যাবে? (মা আযাল্লাহ) কখনই নয়, বরং তার উদ্দেশ্য এতটুকুই ছিল যে, যে ব্যক্তি এই নদীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে সে আমার বন্ধু এবং প্রিয়জনের অন্তর্ভুক্ত হবে; অন্য কিছুই নয়। মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরী এই আয়াতের অনুবাদে লিখেন, যে ব্যক্তি এই নদী থেকে পান করবে সে আমার জামাতের অর্ন্তভুক্ত হবে না, আর যে পান করবে না সে আমার সাথী হবে। (তফসীরে সানায়ি, খন্ড-১, পৃষ্ঠা ১৯৫)

এছাড়াও আল্লামা জালালউদ্দিন সুউতি (রহ.)-ও মিন্নির অনুবাদمن اتباعى (আমার অনুসরণকারী) করেছেন। (জালালাইন, পৃ:৩৬)

এ বিষয়কে স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) এর কথাও উলে-খ করেছেন যে, فمن تبعنى فانہ منى

অর্থ: যে আমার অনুসরন করে সে আমার মধ্য হতে।

আঁ-হযরত (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, انت منى و انا منک (মিশকাত, বাব মানাকেব পৃষ্ঠা ৫৬৪)

এবং আশ'আরি গোত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, هم منى و انا منهم (বুখারী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা ৫০)

একইভাবে হযরত (সা.) ধৈর্য, উত্তমচরিত্র, পারহেযগারী সম্পর্কে বলেছেন,

ثلاث من لم تكن فيہ فليس منى و لا من اللہ (মুজাম সাগীর, তিবরানী)

এ রকম অসংখ্য শব্দ আরবী ভাষায় পাওয়া যায় যাতে هومنہ يا انا منک শব্দসমষ্টি সম্পর্কের দিকে নির্দেশ করে। যদি মিনহুর অর্থ পিতা পুত্রের সম্পর্কের অর্থ হয় তাহলে আয়াত روح منہ (সূরা নিসা) থেকে খ্রিষ্টানদের মসীহকে খোদার পুত্র হিসেবে দলিল পেশ করা সঠিক বলে গণ্য হবে।

সুতরাং এই অর্থ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ইলহাম আনা মিনকা'র অর্থ হবে, আমার তোমার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে লিখেছেন,

"এই ইলহাম (انت منی و انا منک) এর প্রথম অংশ পুরোপুরি স্পষ্ট যে, তোমার বহিঃপ্রকাশ আমার কৃপা এবং অনুগ্রহের ফল আর যে ব্যক্তিকে খোদাতা'লা প্রত্যাদিষ্ট করে প্রেরণ করেন তাকে নিজ ইচ্ছা এবং আদেশে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে প্রেরণ করেন। যেরুপভাবে শাসকদেরও এরকমই নিয়ম-নীতি বিদ্যমান। এখন এই ইলহামে আল্লাহতা'লা যে انا منک বলেছেন এর অর্থ ও উদ্দেশ্য হল, আমার তওহিদ, আমার প্রতাপ এবং আমার ইজ্জতের বহিঃপ্রকাশ তোমার মাধ্যমে হবে। .... এমন এক সময় আসে যখন খোদাতা'লাকে হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়। এটি তখন হয় যখন তার অস্তিত্ব, তার তওহিদ এবং তার গুনাবলির উপর ঈমান থাকে না এবং পৃথিবী নাস্তিক হয়ে যায়। সে সময় যে ব্যক্তিকে খোদা নিজ জ্যোতির বিকাশস্থল করেন সে তার অস্তিত্ব, তওহিদ এবং প্রতাপের প্রকাশের কারণ হয় এবং সে انا منک-র সত্যায়নকারী হয়ে যায়।" (আল হাকাম, খন্ড-৬ পৃ.৪০)

তিনি (আ.) আরো বলেছেন, এমন মানুষ যে আনা মিনকা'র আওয়াজ পায়; সেই সময় পৃথিবীতে আসে যখন খোদার ইবাদতের নাম ও নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই সময়েও যেহেতু পৃথিবীতে পাপ ও অবাধ্যতা অনেক বেড়ে গেছে এবং খোদাকে চেনার এবং খোদাকে পাওয়ার পথ দৃষ্টিপটে আসে না, তাই আল-াহতা'লা এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শুধুমাত্র নিজ কৃপা ও অনুগ্রহ দ্বারা তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন -যেন আমি সেই সমস্ত লোককে যারা খোদাতা'লা সম্পর্কে উদাসীন এবং অজ্ঞ খোদা তা'লা সম্পর্কে অবগত করি আর শুধু অবগতই করি না, বরং যে সততা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্থতার সাথে এদিকে ধাবিত হয় তাদেরকে খোদার

দর্শন করাই। এই জন্যই আল-াহতা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, انت منی و انا منک" (আল হাকাম পত্রিকা, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা ৩৬)

আপত্তির দ্বিতীয় অংশ হল, كان الله نزل من السماء.

এটি হুযুর (আ.) এর ১৮৮৬ সালের ইশতেহার থেকে নেয়া হয়েছে এবং এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, যেন ইলহামে পুত্রকে খোদা আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ সামান্য চিন্তার মাধ্যমেও বুঝা যায়, এই স্থানে ব্যক্তিগত সত্তার সাদৃশ্য নয়, বরং অবতরণ ও আগমনের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। কেননা তিনি বলেছেন,

و مظہر الحق والعلاء و كان الله نزل من السماء" যার অবতরণ অনেক বরকতমন্ডিত এবং ঐশী প্রতাপের প্রকাশের কারণ হবে। নূর আসে নূর! যাকে খোদা নিজ সন্তুষ্ঠির সুবাসে সুরভিত করে। আমরা তার মাঝে নিজেদের রুহ দান করব এবং খোদার ছায়া তার মাথার উপর হবে। সে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে। সে পৃথিবীর কোণে কোণে খ্যাতি পাবে এবং জাতি তার কাছ থেকে কল্যাণ পাবে। তখন তার অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্থিত করা হবে। و كان امرا مقضيا (ইশতেহার, ২০ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬, তবলীগে রিসালাত, খন্ড ১ পৃষ্ঠা ৬০)

এখানে নুযূল বা অবতরণকে মানবীয় গুণাবলির মাধ্যমে একীভূত করে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছে যে, বান্দার অবতরণ ছিল খোদার নয়। নতুবা যদি খোদাই অবতরণ করতেন তাহলে *ঐশী প্রতাপের আগমনের কারণ *খোদার সন্তুষ্টির সুবাসে সুরভিত করা *নিজ রুহ ফুকে দেয়া *খোদার ছায়া তার মাথার উপর থাকা *পৃথিবীর কোণে কোণে খ্যাতি পাওয়া *তার কাছ থেকে জাতির কল্যান পাওয়া *ব্যক্তিগত দৃষ্টিশক্তি আকাশের দিকে উত্থিত করার কি অর্থ?

সুতরাং এখানে নুযুল বা অবতরনের অর্থ হল তার কৃপার প্রকাশ, কেননা তিনি প্রকৃত অর্থে অবতরণ, উড্ডয়ন এবং নড়াচড়া থেকে পবিত্র এবং তিনি সর্বত্র বিদ্যমান। তার নুযূল বা অবতরণের কোন প্রয়োজন নেই।

যের‍ূপভাবে হাদীস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রসুলে করীম (সা.) বলেছেন,

ينزل ربنا تبارک و تعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير

(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত কিতাবুস সালাত পৃষ্ঠা ১০৯)

অর্থ্যাৎ, "আমাদের কল্যাণমন্ডিত ও অতীব উচ্চ প্রভু প্রতি রাতে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং তৃতীয় প্রহর পর্যন্ড় অবস্থান করেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় সমস্ড় বুযূর্গান একমত যে নুযূলুর রাব্বি বা প্রভুর অবতরণের অর্থ হল তার কৃপার নুযূল বা অবতরন। সুতরাং লামাআত-এ আছে,

" النزول والهبوط والصعود والحركات من صفات الاجسام والله تعالى متعال عنه- والمراد نزول الرحمة و قربه تعالى بانزال الرحمة و افاضة الانوار اجابة الدعوات و اعطاء المسائل و مغفرة الذنوب"

(টিকা মিশকাত, মুজতাবাঈ, পৃ.১০৯)

একইভাবে মুয়াত্তা ইমাম মালেকের কিতাবেও লেখা আছে,............

"قوله ينزل ربنا اى نزول رحمة و مزيد لطف و اجابة دعوة و قبول معذرة كما هو ديدن الملوک الكرماء و السادة الرحماء اذا نزلوا بقرب قوم محتاجين ملهوفين لا نزول حركات و انتقال لاستحالة ذلک عليه سبحانه" (বাব মা জাআ ফি যিকরিল-াহ, পৃ.৭৪)

মোটকথা আল্লাহতা'লার নুযূল বা অবতরনের অর্থ হল তার আশিষ ও কল্যানের অবতরন। এই দৃষ্টিতে ইলহামের অর্থ দাঁড়াবে সেই ছেলে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। তার আগমনের সাথে সাথে খোদার কৃপা ও কল্যানের আগমন ঘটবে।

আপত্তি ঃ মির্যা সাহেব হযরত মসীহ (আ.) এর পাখি সৃষ্টির মো'জেযার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। মৃত্তিকা শিল্পের কারুকার্য, রুহুল কুদুসের পুকুরের মাটির প্রভাব, কাঠের কল বা খেলনা এবং নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোক প্রভৃতি অর্থ করেছেন। এই ধরনের অদ্ভুত চিন্তা-ضالين সাথে কি ঐশী জ্ঞানের কোন সম্পর্ক আছে?

জবাবঃ নিঃসন্দেহে কুরআন মজিদে পাখি সৃষ্টির বিষয়টিকে মসীহ (আ.) এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু একে সত্যিকার অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেননা অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন,

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّـهِ (সূরা ফাতের, রুকু ০১) ?

اللَّـهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (সূরা রা'দ রূকু ০১)

لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ (সূরা হজ্জঃ ৭৪)

এ ধরণের অনেক আয়াত এই ধারণাকে ভ্রান্ড় প্রমাণিত করে যে, মসীহ সত্যিকার অর্থে পাখি সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে অন্যান্য তফসীরকারকগণেরও ধারণা ছিল যে, হযরত মসীহ্র সৃষ্টিকৃত পাখি শুধু দর্শকের সামনেই উড়ত এবং আড়ালে যেতেই মরে মাটিতে পড়ে যেত। যেরুপভাবে, আল্লামা জালাল উদ্দিন সুউতি বলেছেন,

خلق لهم الخفاش لانہ اکمل الطیر خلقا فکان یطیروهم ینظرونہ فاذ غاب عن اعینهم سقط میتا- (জালালাইন মাতবাউ মুজতাবাঈ পৃ-৪৯)

ইমাম ওহাব তফসীরে নেশাপুরিতে ইবনে জারিরের খন্ড ৩ পৃ ১৯৫ এর টিকায় এবং আল-ামা ইবনে হাইয়্যান আল বাহরুল মুহিত ২য় খন্ড পৃ ৪৬৬-তে এই ধারণারই প্রকাশ করেছেন যে, তফসীরকারকগণ এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, তা কৃত্রিম পাখি ছিল, সত্যিকার অর্থে ছিল না।

প্রকৃত কথা হল, সত্যিকার অর্থে খোদা ছাড়া অন্য কারোও সৃষ্টিকর্তা হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যেভাবে সমস্ড় তফসীরকারকগণ-এর পাখি সৃষ্টির বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-ও এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং সত্যিকারের পাখি সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি স্পষ্টভাবে

অস্বীকার জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, "এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও পরিত্যাজ্য এবং অংশীদারিত্ব ধারণা যে, মসীহ মাটির পাখি সৃষ্টি করে এবং এগুলোতে ফু দিয়ে সত্যিকারের পাখি বানিয়ে দিয়েছিলেন।" (ইযালায়ে আওহাম)

হযরত মসীহ (আ.) এর নিদর্শনাবলী এবং এর তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"বিরোধীরা বলে থাকে যে, এই ব্যক্তি হযরত মসীহ (আ.) এর পাখি সৃষ্টি করা এবং মৃতকে জীবিত করাকে অস্বীকার করে এবং তাকে মানে না। কিন্তু আমার জবাব হল, আমি হযরত মসীহর অলৌকিকভাবে জীবিত করা এবং অলৌকিক সৃষ্টি বিশ্বাস করি, কিন্তু এই বিষয় মানি না যে, তিনি (আ.) খোদার ন্যায় কোন মৃতকে জীবিত করেছেন অথবা কোন পাখি সত্যিকার ভাবে সৃষ্টি করেছেন। কেননা যদি সত্যিকার অর্থে মসীহ (আ.) এর মৃতকে জীবিত করা এবং পাখি সৃষ্টি করা মেনে নেয়া হয় তাহলে এতে করে খোদা তা'লার সৃষ্টির এবং জীবের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। মসীহ (আ.) এর পাখি মূসা (আ.) এর লাঠির ন্যায় যাকে সে সাপের ন্যায় দৌড়াতো। কিন্তু সবসময়ের সে নিজের প্রকৃত অবস্থাকে পরিত্যাগ করেনি। এরুপভাবে, গবেষকরা লিখেছেন, মসীহর পাখি মানুষের দৃষ্টিপটে থাকা পর্যন্ড় উড়ত। কিন্তু যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত তখন মাটিতে পড়ে যেত এবং নিজের পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরে যেত।" (হামামাতুল বুশরা,পৃ:৯০)

সমস্ত নবীগণকে তার বিরোধীদের উপর বিজয় দান করা হয় এবং এমন মুজেযা প্রদর্শন করা হয় যার কারণে সে গর্ব করে থাকে। যেরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) কে জাদুকরী এবং আ হযরত (সা.) কে বাগ্মীতার মুজেযা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে যখন প্রেরণ করা হয়েছিল তখন ইহুদিদের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা এবং জাদুকরী বিদ্যার অনেক রেওয়াজ ছিল। তাই আল্লাহ তা'লা নিজ হাতে এমন বিবেকপ্রসূত নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেছেন যার সামনে ইহুদিদের চিকিৎসাবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়াবলী পরাজিত হয়েছে।

এই তত্ত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "যারা ফেরাউনের সময় মিশরে এমন এমন কাজ করত যে, সাপ বানিয়ে দেখাতো এবং অনেক ধরণের প্রাণী সৃষ্টি করে তা জীবিত প্রাণীদের ন্যায় চালিয়ে দিত। তা মসীহর সময় সাধারণভাবে ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পরেছিল এবং ইহুদিরা তাদের কাছে অনেক ধরণের জাদুকরী কাজ শিখে নিয়েছিল, যেরুপভাবে কুরআন করীমও এই কথার স্বাক্ষী। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, খোদা তা'লা হযরত মসীহকে বিবেকপ্রসূতভাবে এমন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করেছেন যা একটি মাটির খেলনা কোন সুইচ/কল চেপে বা কোন ফু মারার মাধ্যমে এমনভাবে উড়ত যেরুপভাবে পাখি উড়ে। অথবা না উড়লেও চলাফেরা করত।" (ইযালায়ে আউহাম, ৩য় সংস্করণ, পৃ ১২৫ টিকা)

এরুপভাবে আরো বলেন, "যেহেতু কুরআন শরীফের অধিকাংশ স্থানে রুপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাই এই আয়াতগুলোর আধ্যাত্মিকভাবে এই অর্থও করা যেতে পারে মাটির পাখির অর্থ হল সেই নিরক্ষর ও অজ্ঞ লোক যাদেরকে হযরত ঈসা (আ.) নিজের সাথী বানিয়েছেন। যেন নিজের সাহচর্যে নিয়ে পাখিদের ন্যায় পোষ মানিয়েছেন অত:পর তাদের মাঝে হেদায়াতের রুহ ফুকে দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা উড়তে লাগল।" (ইযালায়ে আউহাম, ৩য় সংস্করণ পৃ ১২৫-১২৬)

মোটকথা হযরত ঈসা (আ) এর নিদর্শন থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কোথাও অস্বীকার করেননি, যতদূর সম্ভব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন ব্যাখ্যা করেছেন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কবিতা লিখেছেন আর নবী কখনও কবি হয় না।

জবাব: অধিকাংশ কবিদের বর্ণনার যথার্থতা বা সত্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, "তারা অতিরঞ্জিতা বা কটুকথা

ব্যবহার করে আর আমরা আমাদের রসূল (সা:) কে কবিতা শিখাইনি।” (সূরা ইয়াসিন ৭০)

এই আয়াতে এটা কোথাও লিখা নাই যে, নবী কখনও কবি হতে পারে না, বরং আঁ হযরত (সা.) সময় ও সুযোগ সাপেক্ষে কবিতা বলেছেন, যেমন তিনি হুনায়নের যুদ্ধে কোন এক সময় বলেন,

أنا النبی لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, খন্ড ৩ পৃষ্ঠা ৬১)

আরেকটি যুদ্ধে যখন হুযুর (সা.) এর আঙুল আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন তিনি আঙুল কে সম্বোধন করে বলেন,

هل أنت الا إصبع دميت، و في سبيل الله ما لقيت

(বুখারী, কিতাবুল জিহাদওয়াস সায়রে, অধ্যায় মাই ইয়ানকিবু ফি সাবিলিল-হ, খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৮১)

এই দুটি পংক্তিই ভারসাম্যপূর্ণ এবং এর ছন্দের মিল রয়েছে আর কুরআন কবিদের মাঝে যারা মুমিন এবং পূন্যকর্মশীলদের তাদের ব্যতিক্রম বলে আখ্যয়িত করেছে। সৈয়্যদনা মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা’লার সত্তা এবং মহানবী (সা.) এর মর্যাদা এবং ইসলামের সত্যতার উপর ভারসাম্যপুর্ণ কবিতা লিখেছেন আর তার উদ্দেশ্য তিনি (আ.) নিজেই বর্ণনা করেছেন যে,

“কোন কবিতা কবির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই,

এতে যে যা মনে করে, আমার দাবী এটাই।”

আপত্তিঃ হযরত মির্যা সাহেব পূর্বে তার অস্বীকারকারীদের কাফের আখ্যায়িত করা থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে **তিনি এবং তার জামা’ত মসীহ মওউদের অস্বীকারকারীদের কাফের মনে করা শুরু করে দেন।**

জবাবঃ হুবুহু এই একই প্রশ্ন হুযুর (আ.) কে করা হয়েছিল। আপত্তিকারক লিখেন, "হুযুর মহোদয় অসংখ্য জায়গায় লিখেছেন যে, কলেমা পাঠকারী এবং ক্বিবলা অভিমুখিদের কাফের বলা কোনভাবেই সঠিক নয়। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেই সকল মুমিন ব্যতিরেকে যারা তাকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায়, তাকে না মানার জন্য কাফের হতে পারে না। কিন্তু আব্দুল হাকিম খানকে তিনি লিখেন যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে আমার দাবি শুনেছে এবং সে আমাকে মেনে নেয়নি, সে মুসলমান নয়। এই বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বর্ণনার মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি 'তিরিয়াকুল কুলুব' ইত্যাদি গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমাকে না মানার কারণে কেউ কাফের হয় না আর এখন তিনি লিখছেন যে, আমাকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায়।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর জবাবে লিখেন, "এটি কতই না অদ্ভুত বিষয় যে, আপনারা কাফের আখ্যায়িতকারী এবং অস্বীকারকারীদেরকে দুই ধরণের মানুষ মনে করছেন। কিন্তু খোদার নিকট একই রকম। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করে না সে একারণেই মান্য করে না যে, সে আমাকে মিথ্যারোপকারী আখ্যা দেয়। কিন্তু আল-াহ্তা'লা বলেন, খোদা তা'লার উপর মিথ্যারোপকারী সবচেয়ে বড় কাফের। যের ূপ তিনি বলেছেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

(সূরা আনআম : ২২)

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় কাফের দুই ধরণের। এক খোদার উপর মিথ্যারোপকারী। দুই, খোদা তা'লার বাণীর উপর মিথ্যারোপকারী।

তাই যেহেতু আমি একজন মিথ্যারোপকারীর মতে খোদার উপর মিথ্যারোপ করেছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি শুধু কাফেরই নই, বরং সবচেয়ে বড় কাফের হলাম। আর যদি আমি মিথ্যারোপকারী না হই, তাহলে সেই কুফরের ফতোয়া তার উপর গিয়েই পরবে। যেরুপ আল্লাহ তা'লা এই আয়াতে বলেছেন। এছাড়া যে আমাকে মানে না সে খোদা ও

রসূলকেও মানে না। কেননা আমার সম্মন্ধে খোদা ও তার রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।”

টিকায় লিখা আছে, “নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি যে খোদার বাণীর উপর মিথ্যারোপ করে সে কাফের। সুতরাং যে আমাকে মানে না সে আমাকে মিথ্যারোপকারী আখ্যা দেয়ার কারণে আমাকে কাফের সাব্যস্ত করে। এজন্য আমাকে অস্বীকার করার কারণে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়।” (হাকীকাতুল ওহী, পৃ ১৬৩, টিকা)

তিনি আরো বলেন, “আমি অবলোকন করছি যে, যত সংখ্যক লোক আমার প্রতি ঈমান আনে না তারা সবাই এমন লোক যে, অন্যান্য সকল মানুষদের মুমিন মনে করে যারা আমাকে কাফের ভাবে। কিন্তু আমি এখনও কিবলা অভিমুখিদের কাফের বলি না। কিন্তু যাদের মাঝে তাদের নিজেদের হাত দ্বারা কুফরির কোন কারণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তাদেরকে আমি কিভাবে মুমিন বলতে পারি।” (হাকীকাতুল ওহী পৃ ১৬৫, টিকা)
অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষজন নিজেদের মাঝে কুফর সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ তারা কাফের হবে না। আর যখন কুফরের কারণ সৃষ্টি করবে তখন কাফের হয়ে যাবে। মুসলমানদের এই কুফরীর দুরবস্থা দেখেই তো আল্লামা ইকবাল বলেন,

তোমরা খ্রিষ্টানরা রয়েছ বেশ-ভূষায় আর সভ্যতায় রয়েছ হুনুদ
আর এরাই মুসলমান যাদেরকে দেখে লজ্জা পায় ইহুদ।”

আপত্তি ঃ মির্যা সাহেব লিখেছেন যে, কুরআন ও হাদিসে প্লেগের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

জবাবঃ কুরআন মজিদে লিপিবদ্ধ আছে,

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

অর্থাৎ, আমরা তার জন্য ভূমি থেকে এক ধরণের কীট নির্গত করব যা তাদেরকে কামড়াবে, কেননা মানুষ খোদার নিদর্শনসমুহে বিশ্বাস করে না। (সূরা নমল ০৬)

‘কাল্লামাহু’ এর অর্থ অভিধানে আঘাত করা। সুতরাং প্লেগের কীটও মানুষকে কামড়ায় আর এভাবেই পে-গে আক্রান্ড় হয়। মুসলিম শরিফের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

فیرغب نبی اللہ عیسی و اصحابہ فیرسل اللہ علیھم النغف فی رقابھم فیصبحون فرسی کموت نفس واحد

অর্থ: সুতরাং খোদার প্রতিশ্রুত নবী মসীহ মওউদ এবং তার সাহাবী প্রকাশিত হবেন এবং খোদা তা’লা তার বিরোধীদের তাবুতে এক ধরণের ফোড়া (প্লেগ) ছড়িয়ে দিবেন। এরপর তারা সকালে একজন মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে। ‘নাগাফ’ অভিধানে ফোড়া (প্লেগ) এর অর্থে এসেছে। (মুসলিম, খন্ড ০২, কিতাবুল ফিতান, পৃষ্ঠা ২৭৭, বাব যিকরে সিফাতিহিল দাজ্জাল)

قدام القائم موتان - موت احمر و موت انیض- الموت الاحمر السیف و الموت الابیض الطاعون-

“ইমাম মাহদির আলামতের মধ্যে একটি হল, তার সামনে দুই ধরণের মৃত্যু প্রকাশিত হবে। প্রথমত, রক্তিম মৃত্যু। দ্বিতীয়ত, শুভ্র মৃত্যু। রক্তিম মৃত্যু তো তরবারির যুদ্ধ এবং শুভ্র মৃত্যু হল পে-গ।” (বাহরুল আনওয়ার, খন্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৫৬)

হযরত মসিহ মওউদ (আ.) স্বয়ং নিজের পুস্তকে কুরআন মজিদ ও হাদিসের উদ্বৃতি দিয়েছেন।

তিনি বলেন, “এটিই প্লেগ আর এটিই দাব্বাতুল আরদ; যার ব্যাপারে কুরআন মজিদে ওয়াদা ছিল যে, আখেরি যামানায় আমরা এর বহিঃপ্রকাশ করব আর এগুলো মানুষকে এজন্য কামড়াবে যে, তারা আমাদের নিদর্শনাবলির উপর ঈমান আনে না।” যেরুপভাবে আল-াহ তা’লা বলেন,

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"আর যখন মসিহ মওউদকে প্রেরণের মাধ্যমে তাদের উপর দলিল প্রমাণ পূর্ণ হবে তখন তিনি ভূমি থেকে এক ধরনের প্রাণী দাড় করাবেন, সে মানুষকে কামড়াবে এবং যখম করবে। এ কারণে যে, মানুষ খোদার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে না।" (নুযূলুল মসীহ ৩৮)

"স্বরণ থাকে যে, আহলে সুন্নতের সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাব এবং শিয়াদের পুস্তক আকমালুদ দ্বিনে স্পষ্টভাবে লিখা আছে যে, মসীহ মওউদ (আ.) এর সময় প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে। বরং আকমালুদ দ্বিন যা শিয়াদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কিতাব, এর ৩৪৮ পৃষ্টায় লিখা আছে, এটিও তার আগমনের নিদর্শন যা তার প্রতিষ্ঠার পুর্বেই হবে অর্থাৎ, সাধারণভাবে এটি গ্রহণীয় হবে যে, পৃথিবীতে কঠোর প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে। (নুযুলুল মসীহ, পৃষ্ঠা ১৮)

আপত্তি ঃ মির্যা সাহেব অ-আহমদীদেরকে কাফের বলেছেন।

জবাবঃ এটা বলা পুরোপুরি ভুল এবং মিথ্যা অপবাদ যে, আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে প্রথমে কাফের ফতওয়া দেওয়া হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সময়ে এই প্রশ্ন তাকে করা হয়েছিল। তিনি (আ.) জবাবে বলেন, "কোন মৌলভী, কোন বিরুদ্ধবাদী অথবা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কি এই প্রমাণ দিতে পারবে যে প্রথমে আমরা ঐ লোকদের কাফের আখ্যা দিয়েছি। যদি কোন এমন কাগজ, বিজ্ঞাপন অথবা পত্রিকা আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কাফের ফতওয়া দেয়ার পূর্বে প্রকাশ করা হয়ে থাকে -যাতে আমরা বিরুদ্ধবাদী মুসলিমদের কাফের আখ্যা দিয়েছি তাহলে তা উপস্থাপন করুন। নতুবা ভাবুন, এটা কত বড় বেঈমানী যে নিজেরাই কাফেরের ফতোয়া দেয় আবার আমাদের উপর এই অপবাদ লাগায় যে, আমরা সকল মুসলিমদের কাফের বলেছি।" (হাকিকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ১২০)

যখন তার (আ.) বিরুদ্ধে মৌলভী আবদুস সামাদ গজনবী সাহেব, মিয়া নজীর হোসেন সাহেব (শায়েখুল কুল) কাজী আবদুল্লাহ,কাজী ওবায়েদুল্লাহ

মাদরাসী ইত্যাদি ব্যক্তি কঠোর ফতোয়া প্রকাশ করেছেন। তখন তিনি (আ.) এই হাদিস অনুযায়ী যে-

ايما رجل مسلم كفر رجلا مسلما فان كان كافرا الا كان هوا الكافر

যদি কোন মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে কাফের বলে তাহলে যদি সেই ব্যক্তি কাফের হয় তাহলে তো ঠিক আছে, নতুবা যে কাফের বলে সে-ই প্রকৃত কাফের। আমরা কোন কলেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে অমুসলিম বলি না; যতক্ষণ না পর্যন্ত সে আমাদের কাফের বলে নিজেই কাফের হয়ে যায়। আপনাদের হয়ত জানা নেই যে, যখন আমি আল্লাহ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছিলাম তখন মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী, আবু সাঈদ সাহেব অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি ফতোয়া তৈরি করেন যাতে লিখা ছিল, এই ব্যক্তি কাফের, এই ব্যক্তি দাজ্জাল, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তার জানাজা যেন না পড়া হয়। যে ব্যক্তি তাকে সালাম দেয় বা হাত মিলায় বা তাকে মুসলমান বলে সেও কাফের। এখন শুন, এটি একটি সর্বসম্মত ঘোষণা যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসীকে কাফের বলবে সে নিজেই কাফের হয়ে যায়। সুতরাং এই ঘোষণা থেকে আমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি। আপনারাই বলুন এই অবস্থায় আমরা কি করতে পারি? আমরা তাদের উপর প্রথমে কোন ফতোয়া দেইনি। এখন যে তাদের কাফের বলা হয় এটি তাদের কাফের ফতোয়া দেওয়ার ফলাফল। এক ব্যক্তি আমাদের মুবাহেলার আহবান জানিয়েছেন। আমরা বলেছি, দু'জন মুসলমানের মাঝে মুবাহেলা জায়েয নয়। তিনি জবাবে লিখেন আমরা তো তোমাকে নিশ্চিতরুপে কাফের জানি। (সরকারী রিসালায়ে কাদিয়ানীয়াত, ইসলাম কে লিয়ে সানগিন খতরা, পৃষ্ঠা ২২)

অন্য এক স্থানে বলেন- "যারা আমাদের কাফের না বলে আমরা তাদের কাফের বলি না, কিন্তু যে আমাদের কাফের বলে তাকে যদি তাকে কাফের না বলা হয় তাহলে এখানে হাদিস ও সর্বসম্মত বিষয়ের পরিপন্থী হয়ে যায়। আর এটা আমরা কখনও করতে পারি না। (মলফুজাত ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৬-৭৭)

আপত্তি ঃ মির্যা সাহেব নিজেকে মানুষও আখ্যা দেন নি বরং নিজেকে লাঞ্ছনার পাত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, তিনি কিভাবে নবী হতে পারেন?

জবাব: হুজুর আলাইহিস সালামের এই পংক্তি তার নম্রতা ও বিনয়ের প্রতীক। একই ধরনের বিনয় হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের মোনাজাতে রয়েছে। সুতরাং যাবুর অধ্যায় ২২ আয়াত ৬-তে লেখা আছেঃ আমি কীট, মানুষ না। আমি লোকদের উলঙ্গতা এবং জাতির নগ্নতা । স্বয়ং আ হযরত (সা.) বলেছেন, ما تواضع عبد الله الا رفعه الله যে ব্যক্তি আল-াহ তাআলার নিকট বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করেন। একদা তিনি দোয়া করতে গিয়ে বলেন اني ذليل فاعزني আমি লাঞ্ছিত আমাকে সম্মান দাও। (মুস্তাদরাক হাকেম)

আপত্তি ঃ মির্যা সাহেব মসীহ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন এবং মসীহ মওউদ হওয়ার দাবি অস্বীকারও করেছেন, যা ইযালায়ে আওহামের নিম্নোক্ত বাক্যাবলী থেকে প্রকাশ পায়। যথা,

১. এই অধম মসীহের অনুরূপ হওয়ার দাবি করেছে, যাকে অজ্ঞরা মসীহ মওউদ মনে করে বসে আছে। এটি কোন নতুন দাবি না যা আমার মুখ থেকে নিসৃত হয়েছ। (ইযালায়ে আউহাম পৃষ্ঠা ১৯০)

২. স্পষ্ট হোক যে, এই বিষয়টি স্বচ্ছ ও পরিস্কার যে, যে ব্যক্তি এই অধমের মসীহ মওউদ হওয়া মেনে নিয়েছ সে প্রত্যেক বিপদ থেকে নিরাপদ এবং নানা ধরণের পুণ্য, প্রতিদান এবং ঈমানকে শক্তিশালী করার যোগ্য হয়েছ। (ইযালায়ে আউহাম পৃষ্ঠা ১৭৯)

জবাবঃ হুযুর আলাইহিস সালাম মুসলমানদের কল্পিত মসীহ মওউদ (হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) হওয়া থেকে অস্বীকার করেছেন, হাদিসের সত্যায়নকারী মসীহ মওউদ (অর্থাৎ মসীহ মওউদ এর অনুরূপ) থেকে নয়।

যেভাবে কয়েক লাইন পরেই তিনি বলেছেন, "আমি এই দাবি কখনোই করিনি যে, আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম। যে ব্যক্তি এই অপবাদ আমার উপর আরোপিত করে সে পুরোপুরি ধোকাবাজ এবং মিথ্যুক। মুসলমানরা ঈসা (আ.)-এর

বাহ্যিকভাবে আগমনের বিশ্বাস রাখত। এ কারণে তাদের সেই কল্পিত মসীহ হওয়া থেকে তিনি অস্বীকার করেছেন।

তিনি লিখেছেন, "আমার জীবনের সাথে মসীহ আলাইহিস সালামের জীবনীর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আর এটিও আমার পক্ষ থেকে কোনো নতুন কথা নয় যে, আমি এসব রাসুলের মধ্যে নিজেকে সেই প্রতিশ্রুত সাব্যস্ত করেছি যার আগমনের খবর কুরআন করিমে রূপকভাবে এবং হাদিসে স্পষ্টভাবে উলে-খ রয়েছে। কেননা আমি তো পূর্বেই বারাহীনে আহমদিয়াতে বিশদভাবে লিখেছি যে, আমি সেই রুপক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি যার আগমনের খবর আধ্যাত্মিকভাবে কুরআন শরীফ এবং হাদীসে নববীতে প্রথম থেকেই রয়েছে।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কুরআন সম্পর্কে লিখেছেন যে, এটি গালিগালাজে পূর্ণ।

জবাবঃ মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে বিরোধীরা আপত্তি করে যে, তার রচনায় কঠোর ভাষা এবং গালমন্দ করতে দেখা যায়। এর জবাব তিনি (আ.) ইযালায়ে আউহামে লিখেন। সেই প্যারা থেকে কর্তিত অংশ নিয়ে সামনের অংশ পেছনে নিয়ে এই আপত্তি করা হয়ে থাকে। মির্যা সাহেবের সেই মূল প্যারা নিচে তুলে ধরা হল,

"স্পষ্ট বিষয়, এই ছিদ্রান্বেষণে আপত্তিকারী সেই শব্দাবলী বর্ণনা করেননি যা এই অধম তাদের ধারণামতে নিজ রচনাবলীতে উল্লেখ করেছি এবং প্রকৃত অর্থে গালিগালাজের অন্তর্ভুক্ত। আমি সত্য সত্য বলছি, যতদূর আমার জানা আছে আমি এমন একটি শব্দও ব্যবহার করিনি যাকে গালমন্দ বলা যেতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এটি যে, অধিকাংশ লোক গালমন্দ এবং সত্য ঘটনা বর্ণনাকে অভিন্ন মনে করে এবং এই দুটি বিষয়কে পার্থক্য করতে পারে না। বরং এমন প্রতিটি বিষয় যা মূলত একটি সত্য ঘটনার বহিঃপ্রকাশ এবং স্বীয় স্থানে যথাযথ কেবলমাত্র এ কারণে যে কিছুটা তিক্ততা থাকার কারণে যা আবশ্যকীয় সত্য তাকে গালমন্দ মনে করে বসে। অথচ গালমন্দ কেবল সেই বিষয়কে বলে যা সত্যের বিপরীত এবং খোচা দেয়ার উদ্দেশ্যে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। **আর যদি প্রত্যেক কঠোর এবং কষ্টদায়ক বক্তব্যকে শুধু এ তিক্ততা এবং কষ্টদায়ক হওয়ার কারণে গালমন্দ বলে মনে করা হয়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, সম্পূর্ণ কুরআন গালমন্দে পরিপূর্ণ**। কেননা যা কিছু মূর্তির লাঞ্ছনা এবং

মূর্তিপূজারীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং তাদেরকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করতে কুরআন শরীফে ব্যবহৃত হয়েছে এগুলো আদৌ এমন নয় যে, এগুলো শুনে মূর্তিপূজারীরা খুশি হবে।" (ইযালায়ে আউহাম পৃ ৮, রুহানী খাযায়েন খন্ড ৩, পৃ ১০৮-১১০) অতএব, এটি কখনও আপত্তি হতে পারে না।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কেন হজ্জ করেন নি। অথচ মুসলিম শরীফে আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ হজ্জ করবেন।

জবাবঃ অন্যান্য আপত্তিগুলোর মতোই এটিও সম্পূর্ণ একটি অজ্ঞতামূলক আপত্তি। কেউ একজন হযরত মির্যা সাহেবকে মৌলভীদের এই আপত্তি তুলে ধরে বলেন, মির্যা সাহেব আপনি কেন হজ্ব করতে যাচ্ছেন না? তখন তিনি সেই প্রশ্নকারীকে খুবই সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত একটি উত্তর প্রদান করেন যা এখানে তুলে ধরছি।

" এইসব লোক শত্রুতাবশতই এহেন আপত্তি তুলে। হযরত মোহাম্মদ (সা.) দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। মক্কা ও মদীনার মধ্যে দূরত্ব মাত্র দুই দিনের ছিল। কিন্তু তিনি (সা.) এই দশ বছরে কোন হজ্জই করেন নি। অথচ তিনি তো বাহন সহ অন্যান্য সকল ব্যবস্থাই করতে পারতেন। কিন্তু হজ্জের জন্য কেবল এই শর্তই প্রযোজ্য নয় মানুষের নিকট হজ্জে যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ রয়েছে বরং এটাও আবশ্যক কোন ধরণের বিপদ ও বিশৃংখলার আশংকা যেন না থাকে। সেখান পর্যন্ড় পৌঁছা এবং নিরাপদে হজ্জ সম্পন্ন করার ব্যবস্থাও যেন উপস্থিত থাকে। যখন পশুস্বভাব সম্পন্ন মৌলভীরা এখানে আমাদের উপর হত্যা করার ফতোয়া প্রদান করে রেখেছে এবং সরকারকেও তারা ভয় করছে না এমতাবস্থায় সেখানে তারা কিবা না করবে। আসলে এসব লোকদের আকাঙ্খাই হচ্ছে, আমরা যেন হজ্জ না করি। যদি আমরা হজ্জ আদায় করি তাহলে কি তারা আমাদেরকে মুসলমান মনে করবে? এবং আমাদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে? ঠিক আছে, প্রথমতঃ এই সব মুসলমান ওলামা একটি অঙ্গীকারনামা লিখে দিক, যদি আমরা হজ্জ করে আসি তাহলে তারা সবাই আমাদের হাতে তওবা করে আমাদের জামাতে প্রবেশ করবে এবং আমাদের মুরীদ হয়ে যাবে। যদি তারা এরূপ লিখে দেয় এবং অঙ্গীকারনামা প্রদান করে তাহলে আমরা হজ্জ করে আসব। আল-াহ তা'লা আমাদের জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিক যাতে করে ভবিষ্যতে মৌলভীদের সকল শত্রুতার অবসান হয়। অনাধিকার করে শত্রুতাসুলভ আপত্তি ভাল নয়। তাদের এই আপত্তি আমাদের উপর পড়ছে না

বরং হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর উপরই পড়ছে কেননা হযরত মোহাম্মদ (সা.)-ও তার জীবনের শেষ বছরেই হজ্জ করেছেন।” (মালফুযাত, খন্ড- ৫ম, পৃষ্ঠাঃ ২৪৮)

সুতরাং মির্যা সাহেবের হজ্ব না করা নিয়ে যারা আপত্তি করে থাকেন পক্ষান্তরে তারা রাসূল (সা.)-এর উপরই আপত্তি করে থাকেন। কারণ রাসূল (সা.)- এর নিকট সমস্ত প্রকারের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, যোগাযোগ ও বাহনের সজলভ্যতা থাকার সত্ত্বেও দীর্ঘ ১০ বছর মদীনা থেকে মক্কায় হজ্বে যাননি কেবলমাত্র শান্তি, নিরাপত্তার কথা ভেবে, নিজের এবং সাহাবীদের প্রাণহানির আশংকা রয়েছে চিন্ড্র করেই। কিন্তু যখন আল-াহ তাকে মক্কা বিজয় দান করেন এবং নিরাপত্তা ও প্রাণহানির আর কোন আশংকা থাকলো না তখন তিনি হজ্ব আদায় করেন আর তাও তাঁর (সা.)-এর জীবনের একেবারে শেষ বছরে দশম হিজরী তথা ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

কাবা শরীফকে দর্শন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্ট আর হযরত রাসূলে মাকবুল (সা.)-এর রওজা জিয়ারত না করতে পারার আক্ষেপ ও দুঃখ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর হৃদয়ে সর্বদাই বিরাজমান ছিল। নীচের ঘটনাটি আমাদের সামনেই সেই চিত্রই তুলে ধরে।

“একদিন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) অসুস্থ বোধ করছিলেন এবং তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) -এর স্ত্রী হযরত আম্মাজান (রা.) এবং তার পিতা মীর নাসের নওয়াব সাহেব ঘরের এক কোনে বসে পরস্পর কথা বলছিলেন। কথা বলার একপর্যায়ে যখন হজ্জের প্রসঙ্গ আসল, হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব বললেন, "আজকের দিনগুলোতে হজ্জযাত্রা খুবই সাচ্ছন্দ্যময় হয়ে গিয়েছে, মানুষ খুবই সহজেই হজ্জে গমন করতে পারছে"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাদের আলোচনা শুনছিলেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) মক্কার কাবা শরীফ এবং মদিনায় হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক সর্ম্পকে ভাবতে লাগলেন। (উভয়ের প্রতি) তার অসাধারণ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ফলশ্রুতিতে তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। হজ্জ করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে পরম বাসনা ছিল এবং তাঁর হৃদয়ে যে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল তাকে তিনি চাপা দিয়ে হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, “এটি সত্য এবং এটি আমার অন্ড়রের অন্ড়স্থলের

চাওয়া, আমি কি কখনো হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক দর্শন করতে পারব?”

আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। পবিত্র কুরআন হজ্জ সম্পাদন করার ব্যাপারে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত জুড়ে দিয়েছে। এগুলো যদি পূর্ণ না হয় তবে কোন মুসলমানের উপরই হজ্ব আবশ্যক নয়। যেহেতু পবিত্র কুরআন সর্বকালের সর্বযুগের জন্য চিরস্থায়ী সংবিধান তাই এই নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ আমাদের জন্যও চিরস্থায়ী যার লংঘন কখনোই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে কি বলছে?

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

অর্থ: আর আল্লাহরই উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা মানুষের জন্য ফরয, (অর্থাৎ তাদের জন্য) যারা সে (ঘর) পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নির্দেশাবলী ও শর্ত যে কোন হজ্ব করার ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। হযরত মির্যা সাহেব কোরআনের নির্দেশিত উপরোক্ত নির্দেশনা মানার কারণেই হজ্বে গমন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে নি। কারণ হজ্জ যাত্রা তার জন্য কখনোই নিরাপদ ছিল না। কারণ আহমদীয়া বিরোধী শত্রুরা তাকে হত্যা করার ফতোয়া অনেক আগেই প্রদান করে রেখেছিল। তাই হজ্জ করার পূর্ব শর্ত যাত্রা নিরাপদ হতে হবে পূর্ণ না হওয়ায় তিনি হজ্জে গমন করেন নি।

তবে এর সাথে আরেকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন হযরত মির্যা সাহেব নিজে হজ্জে গমন করতে না পারলেও তাঁর পক্ষ থেকে তিনি হজ্বে বদল বা বদলী হজ্ব আদায় করে নিয়েছিলেন যা সুস্পষ্টভাবে শরীয়ত ও হাদীস সমর্থিত। হযরত মির্যা সাহেব তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত সাহাবী হযরত আহমদউল-াহ সাহেব (রা.)-কে দিয়ে তাঁর বদলী হজ্ব আদায় করিয়ে নেন।

বাকী থাকল, মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বানী। হাদিসটি হল, ইবনে মরিয়ম ফাজ্জে রাওহা মাকাম থেকে হজ্জ অথবা উমরাহর জন্য ইহরাম বাধবেন। (মুসনাদ আহমদ) এই হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হল, খ্রিষ্টানদেরকে এটি বলা যে, তোমাদের মসীহ বায়তুল্লাহ হজ্জ করবেন। অতএব তোমরা মুহাম্মদ (সা.) এর

শরীয়তে ঈমান আন। এই ভবিষ্যদ্বানী রসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই পূর্ণ হয়ে গেছে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাওহার উপত্যকার পাশে সত্তর জন নবী খালি পায়ে চাদর পরিহিত অবস্থায় খানা কাবার তাওয়াফ করেছেন। এটিই সেই রাওহা স্থান এবং এখানে ঈসা ইবনে মরিয়মও ছিল। (শারহুত তাআররুফ, পৃষ্ঠা ৭)

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কেন বইপুস্তক লিখলেন, কোন নবী তো বই-পুস্তক লিখেননি।

জবাবঃ এই অভিযোগের উত্তরে প্রথমে বলতে চাচ্ছি, একজন নবীর সত্যতার মাপকাঠি পরিমাপ করার জন্য কখনোই এটি যুক্তিযুক্ত ও মানসম্মত দাবী হতে পারে না যে, কোন নবী কোন বইপুস্তক লিখতে পারবে না। এরূপ কথার বা সত্যতা যাঁচাইয়ের দাড়িপাল্লা না পবিত্র কুরআন মজীদের কোন আয়াতে এসেছে না হযরত রাসূল করিম (সা.) কর্তৃক কোন নবীর সত্যতার নিরূপনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। কুরআন-হাদীসের কোথাও এমন কোন কথা লেখা নেই একজন নবী দাবীকারক বই পুস্তক লিখতে পারবে না। আমরা এমন কোন কথা বা বর্ণনা কোথাও দেখতে পাই নি। এখন অভিযোগকারীরা যদি এটিকে নবীর সত্যতার মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরতে চান, তাহলে আপনাদের এখন দায়িত্ব- আপনাদের যুক্তির স্বপক্ষে দলীল তুলে ধরা। এই অভিযোগের ব্যাপারে এককথায় আমাদের উত্তর হচ্ছে- এটি এমন এক দাবী যার কোন ভিত্তি নাই।

আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদের জন্য সেসব যুগের মানুষের কথা চিন্তা ও বিবেচনা করে সেই নবীর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন নির্ধারণ করে দেন। হযরত নূহ (আ.)-এর দিকে লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'লা হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সময়ে নৌকা তৈরীর নির্দেশ দিয়েছিলেন যা ছিল তাঁর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ এবং তাঁর যুগের মানুষের জন্য মহা নিদর্শন। এখন যদি অআহমদী বন্ধুদের অভিযোগটিকে আমরা যুক্তি হিসেবে নিয়ে বলি, হযরত নূহ (আ.) আল-াহর নবী নন কারণ আর কোন নবী নৌকা বানান নি বিষয়টা কেমন হাস্যকর হবে আমরা কি ভেবে দেখেছি। মূলত নবীগণ বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শন করেন আর এ বিষয়ে তারা নিজেরা আল-াহ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হন। তাই দেখা যায় এক নবী এমন কিছু করার জন্যআদিষ্ট হয়েছেন যা ভিন্ন কোন

নবী করার জন্য আদিষ্ট হন নি। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক পুত্র সন্ড়ান ইসমাইল (আ.)-কে কোরবানী বা জবাই করার কথা। এটা কেবল মাত্র তাঁর জন্যই ছিল। এটি নবীদের ক্ষেত্র ও অবস্থা বিবেচনা করে আল-াহ তা'লা নির্ধারণ করে দেন। এতে কিন্তু কখনোই প্রমাণিত হয় না যে, এমন সব নবী যারা পৃথক পৃথক নিদর্শন প্রদর্শন করেছিল এদের একজনের সাথে যেহেতু অন্যজনের নিদর্শনের মিল নেই তাই প্রত্যেক নবীই নাউযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী!

এখন আমরা যদি পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর জন্য নির্ধারিত নিদর্শনের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে আমরা সূরা তাক্বভীরের আয়াত নং ১১ তে দেখতে পাই, আল-াহ তা'লা বলছেন- وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

অর্থঃ যখন পুস্তক-পত্রিকার প্রসারতা ব্যাপক বিস্ড়ৃতি লাভ করবে। (সূরা তাক্বভীরঃ ১১)

এটি একটি মিরাক্কেল বা আলৌকিক ব্যাপার যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর অসাধারণ জ্ঞান ও বুৎপত্তি যা তাঁর লেখনীর মাঝে প্রস্ফুটিত এর অধিকাংশ তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টান, আর্য সমাজী এবং নাস্ড়িকদের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল অভিযোগের উত্তরেই লিখেছেন এবং এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের অসাধারণ অনন্য তত্ত্বজ্ঞান ও তাফসীর তিনি পৃথিবী বাসীর সামনে তাঁর কলমের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। মির্যা সাহেবের সময় তৎকালীন ভারত উপমহাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে আল-াহ, ইসলাম, কুরআন ও খাতামান্নাবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে যে অভিযোগ, আপত্তি আর অপবাদের পাহাড় খাড়া হচ্ছিল মির্যা সাহেব বুক চিতিয়ে এই সমস্ত কিছুর মোকাবেলা করে সকল বিরুদ্ধবাদীদের মুখ তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত অসাধারণ কলমী শক্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

এখন দেখুন, যেভাবে ঠিক বর্তমানে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) -এর অস্বীকারকারীরা তাঁকে এই বলে অস্বীকার করছে, তিনি আবার কেমন রাসূল, কেমন নবী যে দোয়াত, কলম দিয়ে কিতাব লিখে ঠিকই একই কায়দায়, একই ভাষায়, একই চয়নে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সময়কালীন বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর (সা.)-কে নিয়ে এমনই আপত্তি করেছে যে, 'এ আবার কেমন রাসূল যে খাবার খায়, হাট বাজারে চলা ফেরা

করে। আল্লাহ তা’লা পবিত্র কুরআনে তাদের এই দাবীকে এভাবেই বর্ণনা করছেন,

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا

অর্থ: তারা বলে, এ আবার কেমন রসূল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? (সূরা আল ফুরকান ২৫ : ০৮)

একজন নবীর অস্বীকারকারীরা তাঁকে অস্বীকার করছে কেন সে বইপুস্তক লিখেছে এই কারণে আবার ঠিক সেই অস্বীকারকারীরাই নবী মোহাম্মদ (সা.)-কেও অস্বীকার করছে, কারণ সে এমন এক রাসূল যে হাটে বাজারে চলাফেরা করে এবং খাবার খায়!! এটি সত্য ও বাস্ড়ব যে, হযরত মোহাম্মদ (সা.) অশিক্ষিত ছিলেন কিন্তু এটি কেবলইমাত্র হযরত মোহাম্মদ (ষা.)-এর পবিত্র শান ও মর্যাদার জন্যই অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে নির্ধারিত ছিল। এই গুণাবলী অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। অন্যান্য এমন অনেক নবী রয়েছেন যাদের সর্ম্পকে জানতে পারা যায় যে, তারা লেখাপড়া জানতেন। অআহমদী অসংখ্য পবিত্র কুরআন মজীদের তাফসীরকারকরা তাদের প্রদত্ত তাফসীরে এটি লিখে গিয়েছেন যে, হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ড় লেখাপড়া জানতেন এবং লিখতে পারতেন। এসব পড়াশুনা জানা শিক্ষিত নবীদের ক্ষেত্রে এসব অআহমদী আপত্তিকারকরা কি অভিযোগ ও আপত্তি জানাবে এটা তারাই ভাল জানে।

অনেক নবী-রাসূলরা নিজেদের সাথে কিতাব নিয়ে এসেছেন যার দিকে তাঁরা মানুষদের আহ্বান করতো। তাদের এসব গ্রন্থাদীতে উপস্থিত সকল আদেশ-নিষেধ আল্লাহর আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতিতেই পূর্ণ ছিল যা শরীয়তের মর্যাদা রাখতো। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব নিজেকে কোন স্বতন্ত্র নবী-রাসূল বলে দাবী করেন নাই আর তিনি নিজের কোন বইপুস্তককে এই বলে ঘোষনা করেন নাই যে, আমার এই পুস্তক বা গ্রন্থ হলো শরীয়াহ। তাঁর সবগুলো পুস্তক পবিত্র কুরআনের অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যাখ্যা সম্বলিত এক আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার হিসেবেই পরিচিত যা মানুষের জীবন সঞ্জিবনের জন্য অমৃত সুধা হিসেবে কাজ করে।

সর্বশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকষর্ণ করছি তা হলো, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল (সা.) অনুসারে একজন মানুষকে কখনোই জোরজবরদস্তি বা বাধ্য করে ধর্মান্তরিত করা যায় না। প্রতিশ্রুত মসীহর সময়কাল হচ্ছে জিহাদের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু সেই সময় জিহাদ করার অর্থ তলোয়ার দ্বারা জিহাদ করা নয় বরং সেই সময়কার জিহাদ হবে ইসলামের উপর কলমের মাধ্যমে আক্রমন। আর তাই প্রতিশ্রুত মসীহর জন্য আবশ্যক যে, তিনিও তলোয়ারের পরিবর্তে কলম নিয়ে জেহাদের মাঠে অগ্রসর হবেন এবং কলমের মাধ্যমে জিহাদ করে শত্রুদের পরাজিত করবেন। আমরা অসংখ্য হাদীসে দেখতে পাই মসীহ ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর এটি কখনোই তলোয়ারের জিহাদ দ্বারা সংঘটিত হবে না। কারণ তলোয়ারের দ্বারা কোন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর সেই ধর্ম কখনোই মানব হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারে না। আর তাই এটি আবশ্যিকভাবে প্রতিশ্রুত মসীহর কলমের জিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব হবে এবং কলমী শক্তির দ্বারা ইসলামের শাশ্বত, সুন্দর শিক্ষা মানুষের সামনে উম্মোচিত হবে।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কেন ছবি তুলেছেন? অথচ হাদীসে আছে, 'প্রত্যেক চিত্রকর/আকৃতিদাতা জাহান্নামী হবে'। এর প্রমাণস্বরূপ একটি হাদীস পেশ করে। তা হলো-

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ

অর্থ: প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী হবে। (মুসলিম শরীফ, কিতাবুল লেবাস ওয়ায যায়নাহ (পোশাক ও সৌন্দর্য অধ্যায়) মূল হাদীস নং- ৩৯৫২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদীস নং- ৫৩৫৯)

জবাবঃ এখন চলুন প্রথমত আমরা দেখি আল্লাহ নিজে এই সর্ম্পকে কি বলছেন,

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

অর্থ: তিহিই হচ্ছেন আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, আদি সুনিপুণ স্রষ্টা এবং সর্বোত্তম আকৃতিদাতা বা চিত্রকর। (সূরা আল হাশর ৫৯ : ২৫)

এখন এসব অআহমদী বিরুদ্ধবাদী কি বলবে, একই শব্দ যার আরবী 'মুসাওয়ের' (আকৃতিদাতা) সেটা তো আল্লাহ নিজের জন্যই ব্যবহার করছেন?

মনে হচ্ছে নাউযুবিল-াহ আল-াহও তাদের মধ্যেও আছেন যারা নরকে আগুনের শাস্তি পাবে!! এসব বিরুদ্ধবাদীদের মাথায় কি কিছু নেই? আকৃতিদাতা হলেই কি জাহান্নামী হয়ে যাবে?

দ্বিতীয়ত, হযরত সোলায়মান (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এই বর্ণনা এসেছে যে,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

অর্থ: তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ।(সূরা সাবা ৩৪ : ১৪)

এখন এসব বিরুদ্ধবাদী মৌলভী কি বলবে, হযরত সোলায়মান (আ.) যেসব ভাস্কর্য বা মূর্তি বানাতেন তার জন্য তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হবেন? সোলায়মান (আ.)-এর মতো বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বাদশাহ কি জানতেন না, এর দ্বারা শিরক (অংশীবাদিতা) বিস্তার লাভ করতে পারে? অথচ নবীদের প্রধান কাজই হচ্ছে, অংশীবাদিতা দূর করা। পবিত্র কোরআনে মানব জীবনের সকল দর্শনেই সর্বোত্তম ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। চিত্রকর হলেই বা কোন কিছুর আকৃতিদাতা হলেই যে তার জন্য দোযখের শাস্তি প্রাপ্ত হতে হবে এতোট ছোট ও হীনমনা ধর্ম নয় ইসলাম।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন তাফসীর ও সর্বস্বীকৃত পবিত্র কুরআনের তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীর-এ-কবীর' যা হযরত আল-ামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহ.) লিখছেন উক্ত তাফসীরের সূরা আল বাকারার ২৪৮-২৪৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম রাযী (রহ.) বলছেন,

قَالَ أَصْحَابُ الْأَخْبَارِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَابُوتًا فِيهِ صُوَرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ أَوْلَادِهِ، فَتَوَارَثَهُ أَوْلَادُ آدَمَ إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى يَعْقُوبَ

অর্থ: সংবাদদাতা বললেন, আল-াহ তা'লা হযরত আদম (আ.)-এর কাছে একটি তাবূত (সিন্ধুক) পাঠিয়েছেলেন যেখানে হযরত আদমের বংশধরে আবির্ভূত সকল নবীর ছবি ছিল। আদমের বংশধররা এটি উত্তরাধিকার সূত্রে

প্রাপ্ত হয় এবং এটি (সর্বশেষ) ইয়াকূবের নিকট পৌঁছায়। (তফসীর কবির, সূরা আল বাকারা ০২ : ২৪৮-২৪৯)

'তাফসীর-ই- বায়যাবী'- এ 'তাবুত' বা সিন্ধুক সর্ম্পকে এই বর্ণনা এসেছে যে,

وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب

অর্থ: বলা হয় এই সিন্ধুকের মধ্যে হযরত আদম থেকে নিয়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ড় সমস্ত নবীগণের ছবি ছিল আবার অনেকে বলেছেন, 'তাবূত' হচ্ছে, হৃদয় বা জ্ঞান। (তাফসীর-ই- বায়যাবী, সূরা আল-বাকারা ২৪৯-২৫০)

আমি আপনাদের সামনে এই দুইটি প্রধান ও স্বনামধন্য তাফসীরের উলে-খ এই জন্যই করলাম যাতে আপনারা পবিত্র কুরআনে ছবি বা চিত্রকর সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ রাখে তার একটি চিত্র বুঝতে পারেন। তাই বিষয়টি চিন্তা করা দরকার, মূলত হযরত রাসূল (সা.) কোন ধরণের চিত্রকরদের বা আকৃতিদাতাদের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন? ছবি তুললেই কি সে জাহান্নামী হয়ে যাবে কিংবা ছবি তুললেই কি সেই ব্যক্তি শরীয়ত বিরোধি কার্যালাপে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে?

মনে রাখুন, রাসূল করিম (সা.) যে ধরণের চিত্রকরদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা হচ্ছে মূলত রং কলমের মাধ্যমে যে ছবি অংকন করা হয় তার ব্যাপারে। কারণে রঙ পেন্সিলের মাধ্যমে শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে, নিজস্ব ভাবনার জগতে ছবি অংকন করে থাকে। এই ধরণের ছবি তোলাই হচ্ছে আল-াহর রাসূল (সা.)-র হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত। এই রকম শিল্পী বা চিত্রকররা যে কি পরিমান মনের আবহ থেকে ছবি অংকন করে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, যীশু, রাম, কনফুসিয়াস অবতার ও ধর্মগুরুদের চিত্রের দ্বারাই প্রমাণিত। আজকের তাঁদের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই তার সবগুলোই যে চিত্রকরদের কল্পনারূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এগুলো একটিও এসব মনিষীদের আসল ছবি নয়।

তাই চিত্রশিল্পীদের দ্বারা কৃত অংকিত ছবি এবং ফটো (ছবি)-র মাঝে বিশাল একটি পার্থক্য আছে। অংকিত ছবি নিষিদ্ধ কিন্তু ফটো ছবি বৈধ। অংকিত ছবি কোন জিনিসের বাহ্যিক অবয়বকে নিজের মতো করে তুলে ধরে যা মূলত তার অস্তিত্ব বহন করার প্রমাণ দেয়। কিন্তু একটি ফটো বা ছবি কখনো অংকিত ছবির পর্যায়ের ন্যায়। ফটো হচ্ছে সম্পূর্ণ একজন প্রতিভিম্ব যাকে ইংরেজীতে

এককথায় reflection বলা যায়। ফটো তুলার মাঝে যেহেতু কোন ধরনের পরিবর্তনের বা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে না এবং ছবিটি হুবহু প্রতিভিম্ব হয়েই আসে তাই এটি বৈধ। এজন্যই আরবীতে ফটোগ্রাফীকে 'উক্কাস' বা প্রতিভিম্ব শিল্প বলা হয়।

তাই হযরত আবু তালহা (রা.) বর্ণিত একটি একটি হাদীসও এ ব্যাপারে একই মত পোষণ করছে-

أَنَّهُ قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ". يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فِيهَا الأَرْوَاحُ

অর্থঃ যে ঘরে কুকুর এবং (প্রাণীর) ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তিনি এমন মূত্রির দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলেছেন, যার মধ্যে রূহ (আত্মা) থাকে। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস (পোষাক অধ্যায়), বাবু লা তাদখুলুল মালায়িকা বায়তান ফিহী সুয়ারে (যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশেতা প্রবেশ করে না অধ্যায়), হাদীস নং- ৫৬১৫)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কেবলমাত্র এ বিষয়টির দিকেই লক্ষ্য করেই ছবি তুলতে রাজী হয়েছেন। কারণ ফটোগ্রাফী যেহেতু সম্পূর্ণ নিজের প্রতিভিম্ব তাই এতে বিকৃতির আশংকা নাই। তাছাড়া তিনি সেই সব মানুষদের আন্তরিক বাসনা ও ইচ্ছা পূর্ণ করার করার জন্য তাঁর ছবি তোলার ব্যাপারটি অনুমোদন করেছিলেন, যারা সরাসরি তাঁকে চাক্ষুস দেখার সুযোগ লাভ করেন নি।

ইসলামী মৌলবাদীরা ফটোগ্রাফীকে মূর্তিপূজার ধারক ও বাহক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। তারা তখন এমনও কথা বলেছিল, মির্যা সাহেব ভবিষ্যতে নিজের পূজা করার জন্যই ছবি তুলেছেন!!!!! কিন্তু হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাদের এই অবান্ড়র দাবী , ফতোয়া এবং অভিযোগকে ঘৃনাভরে প্রত্যাখান করেছেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) -এর ছবির দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট বুঝায় যায়, তিনি (আ.) কি উদ্দেশ্যে ছবি তুলেছেন। তিনি (আ.) যে কয়টি ছবি তুলেছেন এর সবগুলো ছবির দিকে তাকালেই বুঝা যায় এর মধ্যে বিন্দু পরিমাণ পূজার করানোর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। রানী ভিক্টোরীয়া সময়কালীন সেই ফটোগ্রাফার যে কিনা হযরত মির্যা সাহেবের ছবি তুলেছেন, তিনি বেশ দক্ষ ও

অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার ছিলেন। তিনি ভাল করেই জানতেন কিভাবে ছবি তুললে মির্যা সাহেবের ছবিটি আরও আকর্ষণীয় ও মুগ্ধকর হবে। আর তাই তিনি হযরত আহমদ (আ.)- কে বারবার বলছিলেন, আপনি আপনার চোখকে আরও একটি প্রশস্ড়ভাবে খুলে ক্যামেরার দিকে তাকান যাতে ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় কিন্তু হযরত আহমদ (আ.) কুরআনী নির্দেশ অনুসারে 'দৃষ্টি অবনত' রাখা সর্ম্পকে অবহিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁর চোখ পুরোপুরি খুলেন নি। ফলশ্রুতিতে ফটোগ্রাফার তাঁকে তার অবস্থানের উপরেই ছেড়ে দেন এবং তিনি যেরূপ ছিলেন সে অবস্থায় ছবি তুলে ফেলেন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব বলেন, আমার সময় খোদা হজ্জ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন হজ্জের কোন প্রয়োজন নেই।

জবাবঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেন, "অনেক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, মসীহ মওউদের সময় হজ্জ কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকবে। সুতরাং আমার যুগে একবার কঠিন রোগের প্রাদুর্ভাবের ফলে এক বছর ১৯০০ সালে হজ্জ বন্ধ ছিল।" হুযুর এমনটি কোথাও লিখেননি যে, হজ্জ-এর ফরয মনসুখ হয়ে গেছে। কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে তিনি বলেন, "যার উপর হজ্জ ফরয এবং কোন নিষেধাজ্ঞা নেই সে হজ্জ করবে।"

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব মদ ও আফিমের নেশায় মত্ত ছিলেন।

জবাবঃ তাহলে মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভি, নাযির হুসাইন দেহলভী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী এবং রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি প্রমুখ কি ধরণের বুদ্ধিমান ও মুত্তাকি মানুষ ছিলেন যে, মির্যা সাহেবের সাথে বাহাস ও মুনাযিরা করেছেন। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন, যদি নবুয়্যতের দাবী না থাকত তাহলে তাকে মানতে আমাদের কোন সমস্যা ছিল না। সুতরাং এমন আপত্তির জবাবে লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন বলা ছাড়া আমাদের আর কিছু বলার নেই।

বলা হয়ে থাকে, হযরত মির্যা সাহেব লাহোর থেকে টনিক ওয়াইন চেয়ে পাঠিয়েছিলেন- এ কথা সত্য। কিন্তু অজ্ঞ ও বিবেকহীন ব্যক্তিরা যখন এ বিষয়ে আপত্তি করেছে তখন নিশ্চয় তারা এটিও পড়েছে যে,

- এই টনিক মির্যা সাহেব একজন ডাক্তার সাহেবের মাধ্যমে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।
- এবং মেডিসিন স্টোর থেকে নিতে পাঠিয়েছিলেন। কেননা এই ঔষধ মদের দোকানে পাওয়া যেত না, ঔষধের দোকানে পাওয়া যেত যা সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতি মায়ের মেলেরিয়া জ্বর, রক্তস্বল্পতা ও ক্ষুধামন্দার জন্য উপকারী ঔষধ। (বিখ্যাত চিকিৎসা পুস্তক- মেটেরিয়া মেডিকা অব ফার্মাসিউটিকাল কম্বিনেশনস এন্ড স্পেশিয়ালাইটিস)

মির্যা সাহেবের যে চিঠিকে কেন্দ্র করে এই আপত্তি করা হয় সেখানে ঘুনাক্ষরেও লিখা নাই যে, তিনি নিজের জন্য এটি আনিয়েছিলেন। বরং তিনি গরীব প্রসূতি মায়েদের জন্য এটি আনাতেন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব কলেরায় টয়লেটে পড়ে মারা গেছেন।

জবাবঃ এর জবাবেও সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কথা হল, লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন। মিথ্যাবাদিদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত। তারপরও সত্য সন্ধানীদের জন্য প্রকৃত ঘটনা উল্লেখ করছিঃ
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার জীবনের শেষ পুস্তক পয়গামে সুলেহ যখন লিখছিলেন তখন তার উপর ইলহাম হল, আর রাহীলু সুম্মার রাহীলু ওয়াল মাউতু কারীব। অর্থাৎ, সফরের সময় হয়ে গেছে এবং মৃত্যু সন্নিকট। তখন মসীহ মওউদ (আ.) লাহোরে ছিলেন। এই ইলহাম শুনে হযরত আম্মাজান মসীহ মওউদ (আ.) এর সহধর্মীনী বলেন, এখন কাদিয়ানী যাওয়া উচিত। যা হোক ২৫মে ১৯০৮ তারিখে তিনি (আ.) পয়গামে সুলেহ লিখা পরিপূর্ণ করে কাতেবের কাছে দিলেন। এই প্রবন্ধ লিখতে দিন রাত পরিশ্রম করা, বহু মানুষের সাথে মুলাকাত করা এবং কতিপয় জলসায় বক্তৃতা প্রদানের ফলে তিনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেলেন। রাত ১১টায় পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন হল। তিনি প্রকৃতির ডাকে পায়খানায় গেলেন। দুর্বল হয়ে পড়লেন। এরপর আরেকবার পায়খানায় গেলেন। এবার যখন তিনি পায়খানা থেকে ফিরলেন এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি বিছানায় শুতে গিয়ে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না এবং প্রায় নিঃশক্তি হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। ডাক্তার ডাকা হয়েছে। কিন্তু এরপর আরেকবার পাতলা

পায়খানা হয়েছে যারপর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়লেন যেন তার নার্ভ বন্ধ হয়ে গেছে। এমন সময় তার মুখ থেকে একটিই বাক্য শুনা যাচ্ছিল, **“আল্লাহ মেরে পিয়ারে আল্লাহ।”**

২৬মে ফজরের সময় বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন, নামাযের সময় কি হয়ে গেছে? তিনি বিছানায় দুই হাত তায়াম্মুমের ন্যায় ছুয়ে শুয়ে শুয়ে নামাযের নিয়্যত বাধলেন। তখন পুনরায় বেহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুশ ফিরে পেলেন আবার জিজ্ঞেস করলেন, নামাযের সময় কি হয়ে গেছে? বলা হল, জি হুযুর, হয়ে গেছে। পুনরায় দ্বিতীয়বার নিয়্যত বাধলেন এবং শুয়ে শুয়ে ফজর নামায আদায় করলেন। নামাযের পর যখনই হুশ ছিল তিনি **“আল্লাহ মেরে পেয়ারে আল্লাহ”** বাক্যটি বলতে লাগলেন। ঠিক যেমনটি মহানবী (সা.) মৃত্যু শয্যাশায়ী অবস্থায় বলেছিলেন, **আল্লাহুম্মা বির রাফিকীল আলা**। (বুখারী)।

পরের দিন ২৬মে সকাল ১০ টার কাছাকাছি সময় শ্বাসকষ্ট হতে লাগল। পরিশেষে সাড়ে ১০টার দিকে **“আল্লাহ মেরে পেয়ারে আল্লাহ”** বাক্য উচ্চারণ করতে করতে তিনি তার মাওলার দরবারে উপস্থিত হলেন। (সিলসিলায়ে আহমদীয়া, হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩)

তাঁর মৃত্যুর পর মোল্লারা নোংরা মিথ্যাচার ছড়িয়েছে, মিছিল করেছে। এছাড়া রেলওয়ে অফিসারকে এই মিথ্যা সংবাদ পৌছিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যু কলেরায় হয়েছে তাই তার লাশকে লাহোর থেকে কাদিয়ানে নিয়ে যেতে যেন না দেয়া হয়। যখন আহমদীরা এ খবর পেল মোকাররম শেখ রহমতুল্লাহ সাহেব ডাক্তার মেজর সদরল্যান্ড প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজ লাহোরের কাছে গেলেন যাকে শেষ সময়ে হযরত সাহেবের চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়েছিল। তাকে বিরোধীদের কর্মকান্ড অবহিত করে তিনি তার কাছে যে কারণে হযরত সাহেবের মৃত্যু হয়েছে তার সার্টিফিকেট চাইলেন। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় সার্টিফিকেট লিখেন, “তার মৃত্যু আদৌ কলেরায় হয়নি, বরং স্নায়ু দুর্বলতার আধিক্যের কারণে হয়েছে।” (হায়াতে তাইয়েবা) এরপর রেলওয়ে কর্মকর্তাকে এই সার্টিফিকেট দেখানো হয়েছে যার ফলে তিনি তার লাশ মোবারককে কাদিয়ানে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। যদি কলেরায় মারা যেত তাহলে কখনও রেলওয়ে কর্মকর্তা তার লাশ মোবারক নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতেন না। এ থেকেই প্রমাণ হয়, তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি।

আপত্তিঃ যখনই তিনি মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস ও নবুয়্যতের দাবী করলেন, তার কাছে অঢেল উপঢৌকন আসা শুরু করল এবং শেষ বয়সে তার আয় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ১৯০২ সালে তার আয় আড়াই লক্ষ হয়ে গেল, যে সময় লাখপতি হওয়া বিশাল ব্যপার ছিল। তিনি শেষ জীবনে অর্থের সাথে খেলেছেন। এতটাই উন্নতি করেছেন যে, তার অনুসারীই তার ব্যপারে ছিদ্রান্বেষণ এবং অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে লাগল।

জবাবঃ হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর জবাবে বলেন, একদিকে এই আপত্তি করে আবার অন্যদিকে এমন নবীকে সমর্থন করে যার জীবনযাপনের দৃশ্য হল, হযরত সোলায়মান (আ.) এর ধন-সম্পদ এত ছিল যে, তার শান শওকতের দৃষ্টান্ত পূর্বে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এর কিছুটা অনুমান এ থেকে করা যায় যে, তিনি দুই শ ঢাল এবং তিন শ সিপরে খাটি সোনার বানিয়েছিলেন।

আপত্তিঃ আইয়ামুস সুলাহ-তে বলে লিখা আছে, **আমি কোন মানুষের কাছে কুরআন, হাদিস অথবা তফসীরের এক সবকও পড়ি নাই। অথবা কোন মুফাসসির অথবা মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব বরণ করি নাই।"**

কিন্তু কিতাবুল বারিয়্যাতে লিখা আছে, শিশু বয়সে যখন ৬-৭বছর ছিল তখন একজন **ফার্সি শিক্ষক** হিসেবে ফজলে এলাহীকে রাখা হয়। যখন ১০বছর হল, একজন **আরবী শিক্ষক** রাখা হয়েছে। এরপর যখন ১৭-১৮বছর হল, তখন একজন **মৌলভী সাহেব** গুল আলী সাহেবের কাছে পড়েছি।" অতএব, আইয়ামুস সুলাহ এবং কিতাবুল বারিয়্যাতে বৈপরিত্য পাওয়া যায়। যাতে প্রমাণিত হয়, মির্যা সাহেব মিথ্যা বলেছেন।

জবাবঃ উপরোক্ত উদ্বৃতি দুটিতে কোন বৈপরিত্য নাই এবং এখানে তিনি মিথ্যাও বলেননি। এতে আপত্তিকারকের অজ্ঞতা ও শত্রুতার কারণে এমন মনে হয়।

প্রকৃত বিষয় হল, এই তিন শিক্ষক যাদের কাছে তিনি পড়েছেন এগুলো কেবলমাত্র ঘরোয়া শিক্ষা ছিল। আর এসব শিক্ষক কোন মুফাসসির বা মুহাদ্দিস ছিলেন না। যদি মসীহ মওউদ (আ.) বলতেন যে, তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায় বছরের পর বছর পড়েছেন অথবা নাদওয়াতুল উলামা থেকে কোন বিভাগ থেকে তাখাসসুস করেছেন আর অন্যত্র বলতেন যে, আমি কোন মুফাসসির অথবা মুহাদ্দিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি, তাহলে এটি মিথ্যা।
কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে ফার্সির এক কায়েদা বা আরবীর এক কায়েদা শিখানো হয় এবং সারফ নাহাভ এর কিছু শেখানো হয় তাহলে কষনও এটি বলা যায় না যে, তিনি কোন মুহাদ্দিস বা মুফাসসিরের কাছে শিখেছেন। বরং যে জ্ঞান তফসীরের অথবা কুরআনের অথবা হাদিসের অথবা আরবী ভাষার কিতাব লিখতে অথবা যে সম স্ত দলিল ভান্ডার তাকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য দান করা হয়েছে সেসব খোদা প্রদত্ত জ্ঞান ছিল। এটি কখনও জাগতিক জ্ঞান ছিল না। বিবেক থাকলে বুঝা উচিত যে, ৭-৮ বছরের বালক কিইবা জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

আপত্তিঃ নামাযে যখন ওহী হত তিনি অস্থির হয়ে নামায ছেড়ে দিতেন।

জবাবঃ লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন। ৭ফেব্রুয়ারী ১৯২০ সালের আল ফজলের যে রেফারেন্স দেয়া হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বানোয়াট রেফারেন্স। ৫-৮ফেব্রুয়ারী ১৯২০ সালের আল ফজল একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল অথচ সেখানে এ কথা কোথাও নেই। আর মসীহ মওউদ (আ.) এর এই পদ্ধতি ছিল না। হায়! কতদিন এভাবে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন?

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের হাদিস উল্লেখ করেছেন যে, এটি রসূল (সা.) এর বক্তব্য। কিন্তু এটি মূলত ইমাম বাকেরের বক্তব্য। এটি একটি প্রতারণা। **এটি দুর্বলতম হাদিস**। রাবীদের মধ্যে একজন কাযযাব রাবী রয়েছে।

জবাবঃ আব্দুল মজিদ যে বলল, একজন রাবী কাযযাব এর ভিত্তি কি? সকলের অবগতির জন্য বলছি, ইমাম আবুল হাসান ইমাম বাকের থেকে এই হাদিসটি র্বণনা করেছেন, যিনি হযরত হুসাইন (রা.) এর দৌহিত্র ছিলেন, র্অথাৎ আহলে

বায়তের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব তার ব্যপারে কথা বললে সাবধানে বলা উচিত। কেননা আহলে বায়েতরা কখনও মুহাম্মদ (সা.) এর নাম ধরে রেওয়ায়েত করতেন না। তারা সর্বদা নিজেদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর কথা বর্ণনা করতেন। এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ॥

এছাড়া কুরআন করীমে যে বিষয়ের ভবিষ্যৎদ্বাণী আছে তাকে এভাবে ভুয়া বলে দেয়া পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সূরা কিয়ামার ৮-১০ আয়াতে আছে-

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩

যখন দৃষ্টি চমকে যাবে (৭) চন্দ্র জ্যাতীর্হীন হয়ে যাবে (৮)এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। এখানে স্পষ্টভাবে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বানী করা আছে।

তদুপরি, একজন ব্যক্তি দাবী করার পর যখন চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বানী করলেন। এরপর তা পূর্ণ হল এটা কি এমনিতেই হয়ে গেল? অবশ্যই খোদা তা'লা এটি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এরপর তো এই হাদিস সম্মন্ধে সন্দেহ থাকতেই পারে না, যেখানে আসমান তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং ঘটনা ঘটে গেছে।

অতএব, যারা মানবে না তারা মানবেই না। মির্যা সাহেব এর দাবীর পর বিরুদ্ধবাদীরা বলতে লাগল, চন্দ্র সূর্যগ্রহনের নিদর্শন কোথায়। এরপর যখন তিনি এই নিদর্শন দেখালেন তখন এই আপত্তি করল যে, এমন হাদিস তো যয়ীফ। আল্লাহ্ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করুন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেবের গায়ের রং কালো ছিল, এক চোখ কানা ছিল।

জবাবঃ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তার গায়ের রং বাদামী ছিল আর আগত মসীহ মওউদ (আ.) এর ক্ষেত্রে এই চিহ্নই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া কালো রং তো খারাপ কিছু নয়। এটি বিকৃত মনমানসিকতার ধারক ও বাহক। কালো ব্যক্তি কি আল্লাহর নৈকট্য পেতে পারে না?

দ্বিতীয়ত, তার চোখ কানা ছিল, এটিও আরেকটি ডাহা মিথ্যা কথা। লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন। তোমাদের মত নোংরা মনের অধিকারী কখন এই পবিত্র সত্তার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল। তোমরা আরেকজনের কথা শুনে নিজেদের হৃদয়কে অপবিত্র করছ।

আপত্তিঃ যুবক বয়সে মির্যা সাহেব তার পিতার পেনশনের টাকা নিয়ে আয়েশ করে উড়িয়ে দিয়েছে। (সীরাতুল মাহদীর খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪)

জবাবঃ প্রকৃত ঘটনা ছিল এরুপ: "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার দাদার পেনশনের জন্য সিয়ালকোট গেলেন তখন মির্যা ইমাম উদ্দিন যিনি তার বংশেরই একজন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তার পেছনে পেছনে গেলেন এবং তার কাছ থেকে সেই টাকা ছিনিয়ে নিলেন এবং পালিয়ে গেলেন। এরপর মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে ফিরে গেলেন না এবং এটি ভাল মনে করলেন যে, এই ক্ষতির পর পরিবারের লোকজনকে মুখ দেখানোর পূর্বে চাকুরী করে দিনাতিপাত করবেন।"

এটি মসীহ মওউদ (আ.) এর ভুল করার, তাকওয়া এবং লজ্জার আচরণ দেখতে পেয়েছি। আর পেনশনের টাকা নিয়ে আয়েশ করার যে বিষয়, এর দোষে সম্পূর্ণ দোষী মির্যা ইমাম উদ্দিন।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব নিজেকে মরিয়ম দাবি করেছেন।

জবাবঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে লিখেন, "সূরা তাহরীমেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই উম্মতের কোন কোন ব্যাক্তি মরিয়ম সিদ্দিকার সদৃশ হবেন। যিনি সাধুতা অবলম্বন করেছিলেন, অতপর তাহার গর্ভে ঈসার রুহ ফুকে দেয়া হয়েছিল এবং তার গর্ভে ঈসা (আ.) এর জন্ম হয়। এই আয়াতে এই কথার প্র্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, এই উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হবেন যিনি প্রথমে মরিয়মের মর্যাদা লাভ করবেন, অতপর তার মধ্যে ঈসা (আ.) এর রুহ ফুকে দেয়া হবে। ফলে মরিয়ম হতে ঈসার আবির্ভাব হবে– অর্থাৎ, তিনি মরিয়মী গুন হতে ঈসায়ী গুণে রুপান্তরিত হবেন যেন মরিয়মরুপ গুণ ঈসারুপর সন্তান প্রসব করল এবং এরুপে তিনি ইবনে মরিয়ম নামে অভিহিত হবেন। এমন বারাহীনে আহমদীয়া নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম আমার নাম মরিয়ম রাখা হয়েছে।" (কিশতিয়ে নূহ)

সূরা তাহরীমের ১২-১৩ আয়াত থেকে বুঝা যায় মুমিন দুই ধরণের হয়ে থাকে। ১. আসিয়া (ফেরাউনের স্ত্রীর) স্বরুপ। ২. মরিয়ম স্বরুপ। আসিয়া স্বরুপ হল, সেই সকল মুমিন যারা প্রথমে কুফরীর কাছে পরাজিত থাকে। দ্বিতীয়ত, সেই সকল মুমিন যাদের উপর প্রথম থেকেই মন্দশক্তি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا প্রথম দলের উদাহরণ যাদেরকে পারিভাষিক ভাষায় মরিয়ম বলে থাকে। এরপর মরিয়মি অবস্থা থেকে উন্নতি করে فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا অনুযায়ী ইবনে মরিয়মের অবস্থায় উপনীত হয়। কেননা মরিয়মের মাকাম হল, সিদ্দিকিয়্যাত। আর ইবনে মরিয়মের মাকাম হল, নবুয়্যত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ বিষয়টিই বুঝাতে চেয়েছেন। এতে আপত্তি করার কি আছে?

পরিশেষে তিনি বলেন, "তাই যদিও তিনি বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় খন্ডে আমার নাম মরিয়ম রেখেছেন, এইরুপেই- যেমন ঐ গ্রন্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বছর যাবত মরিয়মরুপ অবস্থায় প্রতিপালিত হয়ে পর্দার আড়ালে বর্ধিত হচ্ছিলাম। অতপর এই অবস্থঅয় দুই বছর অতিবাহিত হলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসার রুহ ফুকে দেযা হয়েছে এবং রুপকভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হয়েছে। (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের অধিক হবে না, এই ইলহাম দ্বারা যা সর্বশেষে বারাহীনে আহমদীয়া চতুর্থ খন্ড ৫৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, আমাকে মরিয়ম হতে ঈসাতে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এইরুপেই আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম হয়েছি।" (কিশতিয়ে নূহ)

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব নিজেকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ বলেছেন।

"মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ওয়াল্লাযিনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বায়নাহুম" ওহীতে আমার নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছে। (ইযালায়ে আউহাম)

জবাবঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আরবী ইবারতকে ইলহাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। কখনও এটি বলেননি যে, কুরআনের আয়াতে যে মুহাম্মদের কথা বলা হয়েছে সেই আমি।

হাদিসেও এসেছে ইমাম মাহদীর নাম মুহাম্মদ হবে। (মিশকাত, বাব খুরুজুল মাহদী)

উপরোক্ত আয়াতে যে মুহাম্মদ (সা.) এর কথা বলা হয়েছে একথা মসীহ মওউদ (আ.) নিজেই বলেছেন। (আরবাঈন, সংখ্যা ৪, পৃষ্ঠা ১২) অতএব, আপত্তির কোন সুযোগ এখানে নাই । আপত্তি করলে আল্লাহর বিরুদ্ধে করেন যিনি এই ইলহাম করেছেন।

আপত্তিঃ فَاَجَائَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ অর্থাৎ, যখন প্রসব বেদনা উঠল তখন তাকে অর্থাৎ এই অধমকে খেজুর গাছের দিকে নিয়ে আসল।

জবাবঃ এই বাক্যের পর পরই মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, সাধারণ মানুষ, অজ্ঞ এবং অবুঝদের খটকা লেগেছে। যাদের কাছে ঈমানের ফল ছিল না। যারা কাফের ফতোয়া দিল, গালিগালাজ করল এবং এক তুফান সৃষ্টি করল। (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, খন্ড ১৯, পৃষ্ঠা ৫১)

এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তিনি (আ.) বলেন, "আমার দাবীর সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি ছিল রিসালাত এবং ঐশী ওহী এবং মসীহ মওউদ হবার দাবী। সে সম্পর্কে আমার ভীতি প্রকাশের জন্য এই ইলহাম হয়েছে فَاَجَائَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ। **মাখায** অর্থ সেই বিষয় যার কারণে ভীতিকর পরিণাম সৃষ্টি হয়। আর জিযইন নাখলাহ্ অর্থ সেই সব লোক যারা মুসলমান সন্তান কিন্তু তথাকথিত মুসলমান। অতএব এর ভাবার্থ হল, পীড়াদায়ক দাবী যার কারণে জাতির শত্রু হয়ে যেতে হয়েছিল সেই প্রত্যাদিষ্টকে জাতির লোকজনের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে যারা শুস্ক খেজুরের কান্ডের ন্যায়। তখন তিনি ভয় পেয়ে বললেন, হায়! আমি এর পূর্বে মরে যেতাম॥

মনে রাখা উচিত, মাখায শব্দটি কষ্ট এবং বিপদের সময় ব্যবহার করা জায়েয। এ জন্য এই ইলহামের উপর আপত্তি করার কোন সুযোগ নেই। যেমন, ইঞ্জিলে আছে, "আমরা জানি যে, সমস্ত সৃষ্টিজগত একত্রে এখনো পর্যন্ত কষ্ট এবং প্রসব বেদনায় পড়ে কাতরায়।" (ইয়াসইয়াহ ২৪:৪২)

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব লিখেছেন, রুপকভাবে আমাকে গর্ভবতী বলা হয়েছে। (কিশতিয়ে নূহ)

জবাবঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ,) হামাল শব্দটির মাধ্যমে বাহ্যিক অর্থে গর্ভবতী বুঝাননি। তিনি এর অর্থ ঈসা (আ.) এর গর্ভে থাকার গুণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, "মরিয়ম অবস্থা ইবনে মরিয়ম অবস্থায় রুপান্তরিত হল। যেন মরিয়ম গুণ ইবনে মরিয়ম গুণ সন্তান প্রসব করল।" (কিশতিয়ে নূহ) অর্থাৎ, মরিয়মের সিদ্দিকিয়্যাতের অবস্থা থেকে ঈসা ইবনে মরিয়মের নবুয়্যতে উপনীত হলেন।

তিনি আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “যেমন ঐ গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আমি দুই বছর যাবত মরিয়মরুপ অবস্থায় প্রতিপালিত হয়ে পর্দার আড়ালে বর্ধিত হচ্ছিলাম। অতপর এই অবস্থায় দুই বছর অতিবাহিত হলে মরিয়মের ন্যায় আমার মধ্যেও ঈসার রুহ ফুকে দেযা হয়েছে এবং রুপকভাবে আমাকে গর্ভবতী নির্দেশ করা হয়েছে।” (বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ খন্ড, ৪৯৬ পৃষ্ঠা) এখানে তিনি পর্দার আড়ালে থাকার অবস্থাটাকে হামাল শব্দে প্রকাশ করেছেন। অতএব, এই উদ্বৃতি পড়লে কোন বিবেকবান ব্যক্তি এখানে আপত্তি করতে পারে না।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব প্রথমে অনুসারীর সংখ্যা পাঁচ হাজার বলেছেন। কিন্তু যখন এক বছর পর আয়করের প্রশ্ন উঠল তখন লিখে দিলেন, আমার অনুসারীর সংখ্যা ২০০।

জবাবঃ প্রথম সংখ্যাটি তার জামাতের সকল সদস্যের ছিল, অর্থাৎ. পুরুষ, নারী, শিশু সবাই। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা যা জরুরুতুল ইমাম পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে সেই সংখ্যা কেবল চাদা দাতা সদস্যদের। এতে যারা চাদা দেয় না তাদের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুতরাং মেজিস্ট্রেট যখন চাদা দাতাদের তালিকা চাইল তখন সেই তালিকাই দেয়া হল। এই বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে বিদ্বেষহীনভাবে বন্ধুদের বিবেচনা করার অনুরোধ রইল।

আপত্তিঃ মির্যা সাহেব রেশমী লুঙ্গি পরিধান করেছিলেন। অথচ এটি পরিধান করা হারাম।

জবাবঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুত্র হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব বলেন, “আমার মা বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সাধারণত রেশমী লুঙ্গি পরিধান করতেন। কেননা তিনি ঘন ঘন প্রসাব করতে হত। এজন্য রেশমী লুঙ্গি পরিধান করতেন যেন খুলতে সহজ হয় এবং গিট লেগে গেলেও খুলতে যেন সময় না লাগে। সুতি লুঙ্গিতে কখনও কখনও তার গিট লেগে যেত, তখন তার অনেক কষ্ট হত।” (সীরাতুল মাহদী, প্রথম খন্ড)
এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত, অসুস্থতার সময় রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম নয়। রসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থতার সময় রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) হযরত যুবায়ের এবং হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কে চুলকানী রোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

অতএব, মসীহ মওউদ (আ.) যেহেতু অসুস্থতার সময় এটি পরিধান করেছেন তাই এখানে আপত্তির কোন সুযোগ নাই।